আবার বাতাস বয়

প্রফুল্ল রায়

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৭১

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

অক্ষরবিন্যাস :
রীতু ডিটিপি সেন্টার
সাউথ গরিয়া

প্রচ্ছদ :
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রক :
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণি
কলকাতা-৪

আশিস ঘোষ
অনুজপ্রতিমেষু

আজও ভবানীপুরে অমরনাথ আর প্রতিমার কাছে যাওয়া হল না সঞ্চারীর। এই নিয়ে পর পর পাঁচদিন।

বরানগর ছাড়িয়ে আরও অনেকটা উত্তরে, রথতলার কাছাকাছি, একটা এন জি ও'তে কাজ করে সে। তার ডাক-নাম রুমি। বেশ উঁচু পোস্টেই আছে—ডেপুটি প্রোগ্রাম অফিসার।

সকালে সরকারি হাউসিং বোর্ডের তৈরি তাদের টালিগঞ্জের পুরনো ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সাড়ে ন'টার ভেতর সঞ্চারীকে রথতলায় পৌঁছে যেতে হয়। ওদের মূল অফিসটা সেখানে, উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বিরাট এক কম্পাউন্ডের ভেতর। তাছাড়া পশ্চিম বাংলার নানা ডিস্ট্রিক্ট টাউনে অফিস না থাকলেও সঞ্চারীদের নিজস্ব লোকজন আছে। তারা ফোনে বা ই-মেলে মেইন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। এখান থেকে সঞ্চারীরা যেমন যেমন নির্দেশ দেয়, ওরা ঠিক তেমনটাই করে।

সারাদিন সঞ্চারীর শুধু কাজ আর কাজ। সন্ধে ছ'টায় অফিস থেকে বেরিয়ে সে সোজা চলে আসে ভবানীপুরে। অমরনাথদের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটিয়ে টালিগঞ্জে ফিরতে ফিরতে সাড়ে-ন'টা, দশটা। এটাই তার দৈনন্দিন রুটিন। কদাচিৎ এর হেরফের ঘটে।

অমরনাথদের সঙ্গে এমনিতে তার কোনও রকম সম্পর্ক নেই। ওঁরা সঞ্চারীর প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়ি। জয়দীপের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর সমস্ত কিছুই তো চুকেবুকে গেছে। ভবানীপুরে আর না যাওয়াই উচিত। কিন্তু না গিয়ে পারে কই? বয়স্ক এই মানুষ দু'টিকে ঘিরে কত যে সমস্যা! ওঁরা তাকে দশ হাতে আঁকড়ে ধরে আছেন। সম্পর্কের অনেকগুলো গিঁট আলগা হয়ে গেলেও দু'-চারটে এখনও এমনই অটুট যে ছিঁড়ে ফেলা যায়নি। কোনও কারণে সঞ্চারী দু'-একদিন যেতে না পারলে অমরনাথরা ভীষণ উতলা হয়ে পড়েন। ফোনের পর ফোন করে যান।

জয়দীপের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গেছে, কিন্তু তারপরও তার মা-বাবার সঙ্গে মেয়ে জড়িয়ে রয়েছে, সঞ্চারীর মা রত্নময়ী তা মোটেও পছন্দ করেন না। এটা শুধু অস্বস্তিকরই নয়, ভীষণ দৃষ্টিকটুও। বিয়ের পর জয়দীপ কম কষ্ট দিয়েছে সঞ্চারীকে! সে এক নরকযন্ত্রণা। মেয়ের মতো রত্নময়ীরাও কি কম যাতনা ভোগ করেছেন! তিনি মনে করেন কোর্টের রায়ে কাটান ছাড়ান যখন হয়েই গেছে, পচা গলা নষ্ট অতীতের জের টেনে চলার কী দরকার? যা শেষ হয়ে গেছে তার

প্রতি এখনও কিসের এত টান! তার ওপর চিরকালের মতো পর্দা টেনে দিতে চান তিনি। কিন্তু মেয়ের মতিগতির তলকূল পাওয়া ভার। তার কী ইচ্ছা, কে জানে।

দীপকও চায় না সঞ্চারী ভবানীপুরে যাতায়াত করে। এই ব্যাপারে সে আদৌ খুশি নয়। মুখ ফুটে অবশ্য এ নিয়ে কখনও কিছু বলেনি, কিন্তু তার হাবভাবে কথায়বার্তায় তা আঁচ করা যায়। কিন্তু দীপক, রত্নময়ী বা অমরনাথদের কথা পরে।

সঞ্চারী যে এন জি ও'তে রয়েছে সেখানে ভীষণ কাজের চাপ। 'রেপ ভিকটিম' অর্থাৎ যে ধর্ষিত মেয়েদের তাদের স্বামী বা মা বাবা ভাইবোন এবং আত্মীয় পরিজনেরা দূষিত আবর্জনার মতো ছুড়ে ফেলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাদের পা রাখার এতটুকু জায়গা নেই, চারদিক থেকে তাদের কুড়িয়ে এনে সঞ্চারীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় দেয়। এ-জাতীয় মেয়েদের সংখ্যা দিন দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। সকালবেলা খবরের কাগজে চোখ রাখলে আঁতকে উঠতে হয়। কলকাতা তো বটেই, মাঝারি এবং ছোট ছোট মফস্বল শহর এবং দূর দূর গ্রামগুলোতে নারীধর্ষণের ভয়াবহ সব বিবরণ থাকে। প্রথম পাতায়, পাঁচের পাতায়, সাতের পাতায়। সবিস্তার। অডিও-ভিসুয়াল মিডিয়া অর্থাৎ টিভি'র নানা চ্যানেলও এই ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠেছে। তারাও এই সর্বস্ব-খোয়ানো মেয়েদের মুখ পর্দায় দেখিয়ে তাদের লাঞ্ছনার বিবরণ দিয়ে যায়। কিন্তু খবরের কাগজ ক'টাই বা ছাপতে পারে! টিভি'র পক্ষে ক'জনের খবর জোগাড় করাই বা সম্ভব! এন জি ও চালাতে গিয়ে সঞ্চারীরা জানে, কাগজে যা বেরোয়, টিভি যা দেখায়, আসল সংখ্যা তার শতগুণ।

সঞ্চারীদের অর্গানাইজেশনের নাম 'আশ্বাস'। শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে ধ্বস্ত, ভাঙাচোরা যে-মেয়েরা এখানে থাকে তাদের বিয়ে-টিয়ে দিয়ে সুখের সংসারে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব। আকাশে ফুল ফোটানোর মতো অলীক কল্পনা। এই সব দাগী যুবতীদের কে বিয়ে করবে? তেমন সাহস, তেমন মহানুভবতা কি কারও আছে? পৃথিবীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেউ কি বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলতে পারে, 'এই ধর্ষিতা মেয়েটাকে স্ত্রী হিসেবে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম। তোমরা যা পার, কর।' না, জগৎসংসারে এমন উদার, এমন মহানুভব একটি ছেলেকেও কি পাওয়া যাবে? অসম্ভব।

বিয়ে হল না, প্রিয়জনেরা দূর করে দিল। অথচ নিজেদের লেশমাত্র অপরাধ

নেই। কী করবে এরা? অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে পাক খেতে খেতে পৌঁছে যাবে নরকের শেষ মাথায়, যার নাম বেশ্যাপাড়া। সেখানে শুধুই গ্লানি, শুধুই ক্লেদ আর প্রতিদিন একটু একটু করে মরে যাওয়া।

না, এভাবে ওদের জীবন ছারখার হতে দেওয়া যায় না। সঞ্চারীরা মনে করে, অপার মমতায়, অবিরল বুঝিয়ে সুঝিয়ে, ওদের মধ্যে খোয়ানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায়, ওদের স্বয়ম্ভর করে তোলা যায়, যাতে কারও গলগ্রহ না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থাও করা যায়। আর সেই কাজটাই করে থাকে সঞ্চারীদের এন জি ও 'আশ্বাস'।

সঞ্চারীকে 'আশ্বাস'-এর মেয়েদের নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকতে হয় যে মাঝে মাঝে দুপুরের লাঞ্চ খাওয়ার কথাও খেয়াল থাকে না। তখন পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তার সামনে থেকে পুরোপুরি মুছে যায়। মা বাড়ি থেকে হট কেসে ভরে ভাত ডাল ভাজাভুজি মাছের ঝোল ইত্যাদি দিয়ে দেন। প্রায়ই সেসব তেমনিই ফিরে আসে। এই নিয়ে মায়ের বকুনিও খেতে হয় যথেষ্ট।

কেন টানা পাঁচদিন ভবানীপুরে অমরনাথদের কাছে সঞ্চারীর যাওয়া হয়নি, এবার সেটা জানানো যেতে পারে।

ঠিক পাঁচ দিন আগে পশ্চিম বাংলার নানা এলাকা থেকে তিনটি মেয়েকে 'আশ্বাস'-এ নিয়ে আসা হয়েছিল। এদের একজন মুর্শিদাবাদের, একজন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার, একজন চুঁচুড়ার।

মুর্শিদাবাদের মেয়েটির নাম কমলা। তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ওর বিয়ের ঠিক পরে পরেই মা-বাপ মরে গিয়েছিল। একা যুবতী মেয়ে। বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ি কোনও দিকেই মাথার ওপর এমন কেউ নেই যে তাকে আগলে আগলে রাখতে পারে। লেখাপড়া প্রায় কিছুই করেনি, কোন ছেলেবেলায় ঠেলেঠুলে বাংলা প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগটা শেষ করেছিল, তার কিছুই প্রায় মনে নেই। এই বিদ্যেয় চাকরি বাকরি হয় না। তাদের গাঁয়ের এক ছোটখাটো স্কুলে হেড-দিদিমণির হাতে-পায়ে ধরে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। ঝাঁটপাট দিয়ে ক্লাসরুম সাফ করা, দিদিমণিদের জন্য চা তৈরি, কাপ-প্লেট ধোয়া থেকে তার হাজারটা ডিউটি। আজকাল গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের সরকার থেকে মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে রান্নাবান্না করে কমলাকে ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে হত। সে থাকত বাপের একটা হেলে-পড়া,

আদ্যিকালের পুরনো টালির চালের ঘরে। সেটার টিনের বেড়া টুটো ফুটো, ঘুণে-ধরা দরজা, মাটির মেঝে। খাটাখাটুনিটা খুবই বেশি। তবু কাজটা সম্মানজনক। কারও করুণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হচ্ছিল না।

একদিন রাত্তিরে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে অসাড়ে ঘুমোচ্ছিল কমলা। তার ওপর যে কিছুদিন ধরে শনির দৃষ্টি পড়েছে, ঘুণাক্ষরেও তা টের পায়নি। সেদিন চালের টালি খুলে একটা লোক ভেতরে ঢুকে তার মুখ বেঁধে চরম সর্বনাশটি করে। জানাজানি হবার পর স্কুলের চাকরিটা চলে যায় কমলার। কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না, কেউ তার ছায়া মাড়ায় না। কুষ্ঠ রোগীর মতো সবাই তার সঙ্গ এড়িয়ে চলে। তার ওপর মানুষজনের শুধুই ঘৃণা এবং ধিক্কার। এই অবস্থায় কি বাঁচা যায়? সঞ্চারীদের যে কর্মীটি মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রয়েছে, খবর পেয়ে সে কমলাকে 'আশ্বাস'-এ পৌঁছে দিয়ে যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মেয়েটি হল সন্ধ্যা। হা-ভাতের ঘরে জন্ম। বাপ আছে, মা আছে, কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। বাপ বারোমাস হাঁপানিতে ভোগে। রোগা, দড়িপাকানো, হাড়সার চেহারা। দু'পা হাঁটলে মাথা ঘুরে পাক খেয়ে পড়ে যায়। সংসার চালায় মা আর মেয়ে। মা পয়সাওলা লোকের বাড়িতে কাজ করে। সন্ধ্যা খাটে জোতদারের চাষের জমিতে। একদিন খেতের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিল সে। ততক্ষণে সূর্য ডুবে আঁধার নেমে এসেছে। ধানজমির পর এবড়োখেবড়ো বিশাল বাঁজা মাঠ। কাঁকরে বোঝাই। এই মাঠটা পেরুলে তবেই সন্ধ্যাদের গাঁ। সেই ভর সন্ধেবেলায় চারদিক একেবারে নিঝুম, জনমানবশূন্য। সে যখন মাঠের মাঝামাঝি চলে এসেছে, আচমকা চার-পাঁচটা লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে তাকে ঘিরে ধরে। আতঙ্কে সন্ধ্যা চেঁচিয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক কড়া-পড়া কর্কশ হাতে তার মুখ ঠেসে ধরে থাকে। তারপর শুরু হয় গণধর্ষণ। একসময় সন্ধ্যার চোখের সামনের ঝাপসা মাঠটা চাপ চাপ গভীর অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়।

রক্তাক্ত, বেহুঁশ, ছিন্নভিন্ন সন্ধ্যাকে কারা মাঠ থেকে তুলে এনে পরদিন তার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল, সে জানে না। কিন্তু অমন একটা ঘটনার পর যে আশ্রয়টা তার সবচেয়ে নিরাপদ হবার কথা, সেখানে তার জায়গা হয়নি। একটা ধর্ষিতা মেয়ে গাঁয়ে থাকবে, এলাকার কেউ তা চাইছিল না। তাকে তাড়াবার জন্য জোট বেঁধে সবাই তার মা-বাপের ওপর চড়াও হয়েছিল। গাঁয়ে থাকতে হলে মেয়েকে রাখা চলবে না। মা আর বাপ পাগলের মতো তাদের

পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে সমানে বলে গেছে, 'তোমরা আমার মেয়েটারে দয়া কর। গাঁ-ছাড়া করলি কুথায় যাবে ও?' কিন্তু তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। অন্যায় করল কারা আর তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছিল এক নিরপরাধ মেয়েকে। সন্ধ্যার কথা জানতে পেরে তাকেও 'আশ্বাস'-এ নিয়ে আসে সঞ্চারীরা।

হুগলির মেয়েটির নাম মালতী। তারা থাকত অখ্যাত নগণ্য এক শহরে। তার স্বামী হরেন পার্টটাইম চোর, পার্টটাইম সিনেমার টিকেটের ব্ল্যাকার। শহরের দু'টো সিনেমা হলে নতুন হিন্দি ছবি রিলিজ করলে লাইন দিয়ে, হল্লা বাধিয়ে, মারামারি করে গোছা গোছা টিকিট কিনে চড়া দামে বেচত।

নানা গুণের আধার ছিল হরেন। মাতাল, জুয়াড়ি, রগচটা। সারাক্ষণ দিশি মদ চড়িয়ে টং হয়ে থাকত। একবার নেশা আর জুয়ার টাকায় টান পড়ায় মালতীকে এক পাঞ্জাবি ট্রাক ড্রাইভারের হাতে তুলে দেয়।

মালতী ভালো মেয়ে। সে আঁচড়ে কামড়ে চেঁচিয়ে যতক্ষণ পেরেছে নিজের ইজ্জত বাঁচাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু ছ'ফিট লম্বা, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা দৈত্যের সঙ্গে একটি নরম সরম বাঙালি মেয়ে কতক্ষণ লড়তে পারে! সমস্ত রাত তার রসটুকু নিঙড়ে নিয়ে ছিবড়ের মতো তাকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে চলে গিয়েছিল ড্রাইভারটা। যার নেশাভাঙের জন্য সর্বস্ব খোয়াতে হল মালতীকে, সেই হরেন তাকে ঘরে ফিরিয়ে নেয় নি। তাকেও শেষ অব্দি 'আশ্বাস'-এ নিয়ে আসা হয়।

দেড়শো'রও বেশি মেয়ে রয়েছে সঞ্চারীদের প্রতিষ্ঠানে। এরা মান-সম্মান হারিয়ে এখানে এসে প্রথম প্রথম বেশ কিছুদিন একেবারে নিঝুম হয়ে থাকত। বোবা এবং বধির। কিছু বললে সাড়া দিত না। পৃথিবীর কোনও শব্দ তাদের কানে ঢুকত না, কোনও দৃশ্য দেখতে পেত না। এক-একটি অনুভূতিশূন্য জড়পিণ্ড। দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে তারা বসে থাকত আর তাদের দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে যেত—বিরামহীন। তারপর ওরা ধীরে ধীরে সব মেনে নিয়েছে, জড়িয়ে পড়েছে 'আশ্বাস'-এর নানা কর্মকাণ্ডে। ভেবেছে এটাই তাদের ভবিতব্য। যা ঘটে গেছে, হয়তো সেটা ভুলে যেতে চায়। বাইরে থেকে তাই মনে হয়েছে সঞ্চারীর। কিন্তু নিষ্পাপ মেয়েদের জীবনে যা সবচেয়ে পবিত্র সেটা ধ্বংস হয়ে যাবার পর সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি কি একেবারে মুছে ফেলা যায়? মনপ্রাণ ঢেলে 'আশ্বাস'-এর কাজ করে গেলেও গোপনে গোপনে তারা হয়তো নরকযন্ত্রণা

ভোগ করে। মানুষের মনের অদৃশ্য কোনায় কোনায় কী ক্লেশ যে জমে থাকে তা কি মুখ দেখে বোঝা যায়?

'আশ্বাস'-এ এত এত মেয়ে এসেছে, নিয়মিত আসছেও কিন্তু কমলা, সন্ধ্যা আর মালতী তাদের মতো নয়। অন্য মেয়েগুলো লজ্জায়, গ্লানিতে জড়সড় হয়ে থাকে। কিন্তু এই তিনটি মেয়ে 'আশ্বাস'-এ পা দিয়েই পাঁচ দিন ধরে চারদিক তোলপাড় করে ফেলেছে। উন্মাদের মতো মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে সমানে চিৎকার করে গেছে। কখনও বা ঘরের দেওয়ালে আর মেঝেতে কপাল ঠুকে ঠুকে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়েছে। খানিকক্ষণ এইভাবে চলার পর তারা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, তারপর ফের সেই তুমুল কান্নাকাটি আর কপাল ঠোকা।

পাঁচ-পাঁচটা দিন এইভাবে কেটেছে। 'আশ্বাস'-এর অন্য সব কাজকর্ম বন্ধ করে সঞ্চারী আর তার সহকর্মী পারমিতা, স্বাতী এবং আরও কয়েকজন সমানে তিন মেয়েকে বুঝিয়েছে। সন্ধ্যা, মালতী আর কমলা অনবরত বলে গেছে, তারা বাঁচতে চায় না। তাদের বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হোক। নইলে সঞ্চারীরা তাদের ছেড়ে দিক। রেললাইনে গলা দিয়ে তারা আত্মহত্যা করবে।

সঞ্চারীর ডিউটি সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সন্ধে ছ'টা অব্দি। কিন্তু সন্ধ্যাদের নিয়ে আসার পর সাড়ে-আটটা পৌনে ন'টার আগে বেরুতে পারত না। সে চলে আসার পর রাত্তিরে স্বাতীরা পালা করে ডিউটি দিয়েছে। তিন মেয়ে যাতে কোনও অঘটন ঘটিয়ে না বসে, সেজন্য চোখের পাতা টান করে ওদের জেগে থাকতে হয়েছে।

*

পাঁচ দিন পর আজ বিকেলের দিকে অনেকটা শান্ত হয়েছে সন্ধ্যারা। হয়তো ধরে নিয়েছে 'আশ্বাস'-এই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। এটাই তাদের নিয়তি।

এই পাঁচদিনে অমরনাথরা রোজ তিন-চার বার করে ফোন করেছেন। তাঁদের জীবনে নতুন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সঞ্চারী ভবানীপুরে না গেলে তাঁরা ভীষণ বিপন্ন হয়ে পড়বেন। কিন্তু সন্ধ্যাদের নিয়ে এমন হুলস্থূল কাণ্ড গেল যে যাওয়াই হয়নি। অমরনাথদের সমস্যাটা কী ধরনের, বার বার জিগ্যেস করেও জানা যায়নি। ওঁরা শুধু জানিয়েছেন, যা বলার সামনাসামনি বসেই বলবেন। ওঁদের সমস্যা নিয়ে সঞ্চারীর যত না কৌতূহল তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্বেগ। কিন্তু কিছুই করা যায়নি। রাত আটটা সাড়ে-আটটায় 'আশ্বাস' থেকে বেরিয়ে

অমরনাথদের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরবে কখন? কম করে ঘণ্টা দেড় দুই ওঁরা তাকে আটকে রাখবেন? রাত সাড়ে-এগারোটা বারোটায় বাস পাওয়া যাবে না, পাতালরেল তার আগেই বন্ধ হয়ে যাবে।

ইচ্ছা করলে আগের মতোই আজও ছ'টায় বেরিয়ে ভবানীপুরে যেতে পারত সঞ্চারী। কিন্তু সন্ধ্যারা চুপচাপ হয়ে গেলেও ফের তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসে কিনা, সেটা লক্ষ করার জন্য আরও অনেকটা সময় ওদের সঙ্গে কাটিয়ে আটটায় অফিস থেকে বেরুল সে।

আজও তাই হল না, কাল নিশ্চয়ই অমরনাথদের সঙ্গে দেখা করবে সঞ্চারী।

॥ দুই ॥

রথতলা থেকে বাসে শ্যামবাজার। সেখান থেকে মেট্রো ধরে টালিগঞ্জ স্টেশন। তারপর অটোয় মিনিট দশেক গেলেই তাদের হাউসিং কমপ্লেক্স। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে সরকারি হাউসিং বোর্ড এই আবাসনটা তৈরি করেছিল। সঞ্চারীর জন্মের বারো-তেরো বছর আগে। তার বাবা এখানে একশো সত্তর টাকায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন। বাবা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। কিন্তু মৃত্যুর আগেই গভর্নমেন্টের উঁচু মহলের কাকে যেন ধরে ফ্ল্যাটটা মায়ের নামে করিয়ে নিয়েছিলেন। মা যতদিন বেঁচে আছেন, ওখানেই তারা থাকতে পারবে। তবে কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে, নামমাত্র দামে ফ্ল্যাটগুলো ভাড়াটেদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হবে। কেননা ভাড়া হিসেবে যা পাওয়া যায়, আবাসনের মেনটেনান্স বা রক্ষণাবেক্ষণের খরচ তার চাইতে ঢের বেশি। সরকার বছরের পর বছর এই খরচের বোঝা আর টানতে পারছে না। ঘাড় থেকে আবাসনটা ঝেড়ে ফেলে হালকা হতে চাইছে।

সঞ্চারী মোটামুটি ঠিক করে রেখেছে, সরকার যদি সত্যিই ফ্ল্যাট বেচে দেয়, ব্যাঙ্ক থেকে লোন-টোন নিয়ে কিনে নেবে। নিতেই হবে। কেননা কলকাতায় জমি বাড়ি এবং ফ্ল্যাটের দাম আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। নতুন একটা ফ্ল্যাট কেনা সঞ্চারীদের কাছে আকাশকুসুমের চাইতেও অভাবনীয় ব্যাপার। নতুন ফ্ল্যাট যে ভাড়া নেবে, তাও সাধ্যের বাইরে। টালিগঞ্জের এই এলাকায় পাঁচ ছ'হাজারের কমে দু'কামরার ফ্ল্যাট কোনও ভাবেই ভাড়ায় পাওয়া যাবে না। তার ওপর চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স। অসম্ভব, অসম্ভব।

রথতলা থেকে টালিগঞ্জ পৌঁছতে ঘণ্টা দেড় দুইয়ের মতো লাগে। সঞ্চারী যখন অটো থেকে তাদের আবাসনের সামনে নামল তখনও দশটা বাজেনি। মিনিট সাতেক বাকি।

কয়েক বছর আগেও টালিগঞ্জের এই অঞ্চলটা রাত্তির ন'টা বাজতে না-বাজতেই নিঝুম হয়ে যেত। আজকাল লোকজন গাড়ি-টাড়ি প্রচুর বেড়ে গেছে। নতুন নতুন হাই-রাইজে ভরে যাচ্ছে চারদিক। এখন কত যে দোকান, চোখধাঁধানো শো-রুম, কত যে ঝকঝকে রেস্তোরাঁ! এই রাত দশটাতেও সারা এলাকা গমগম করছে।

সঞ্চারীদের হাউসিং কমপ্লেক্সটা বড় রাস্তার ওপরে। অটো থেকে সে যেখানে নামল তার ঠিক উলটো দিকে।

রাস্তা পেরিয়ে আবাসনে চলে এল সঞ্চারী। গেটের মুখে ক'টা ছেলে গুলতানি করছিল। এই আবাসনেই ওরা থাকে। কেউ পড়াশোনা শেষ করে চাকরি বাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। কেউ সবে চাকরিতে ঢুকেছে। কেউ বা রিসার্চ-টিসার্চ করছে। সবার হাতেই সিগারেট। সন্ধের পর থেকে দশটা সাড়ে-দশটা অব্দি ওরা এখানে জটলা করে।

ছেলেগুলোকে জন্মাতে দেখেছে সঞ্চারী। ভালো পরিবারের ছেলে, খুবই ভদ্র।

ইদানীং ছেলেমেয়েরা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বেশির ভাগই বেপরোয়া, উদ্ধত। সময়টাই গোলমেলে। বয়স্কদের তারা সম্মান করে না। মুখের ওপরেই হয়তো সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে দিল। এমন নোংরা, অশ্লীল মন্তব্য করে বসল যাতে গা রি-রি করে ওঠে।

কিন্তু সঞ্চারীদের আবাসনের ছেলেরা সেরকম নয়। তাকে, শুধু তাকেই বা কেন, এখানে বয়সে যারা বড়, তাদের সবাইকে এই ছেলেরা যথেষ্ট সমীহ করে।

সঞ্চারীকে দেখে ছেলেগুলো হাতের সিগারেট লুকিয়ে ফেলল। ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে এগিয়ে গেল সে।

আবাসনটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। উঁচু কম্পাউন্ড ওয়াল দিয়ে ঘেরা। সব মিলিয়ে এখানে তেইশটা চারতলা বিল্ডিং। প্রতিটি বিল্ডিংয়ে আটটা করে ফ্ল্যাট।

চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের পুরনো বাড়িগুলোর গায়ে জরার ছাপ স্পষ্ট। শ্যাওলা-ধরা, প্ল্যাস্টার-খসা, মলিন চেহারার এইসব ইমারত কোনও রকমে

দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়ির মাঝখানে খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা; সেখানে শুধুই আগাছার ঝাড়। যত্ন করলে এই কমপ্লেক্সটা ফিটফাট করে রাখা যত। কিন্তু সরকারের দিক থেকে তেমন কোনও সদিচ্ছাই নেই। কেমন একটা গা-ছাড়া ভাব। চার-পাঁচ বছর পর পর দেওয়ালে একটু-আধটু তাপ্পিতুপ্পি লাগিয়ে, ভাঙাচোরা ঝুরঝুরে দু-একটা রেন ওয়াটার পাইপ বদলে, দায়সারা চুনকাম করে তাদের কর্তব্য শেষ। কমপ্লেক্সের বাসিন্দাদের কাছ থেকে যা ভাড়া পাওয়া যায়, তাতে এর চেয়ে বেশি কিছু সম্ভব নয়। ভাড়াটেরা দশ পয়সা খরচা দিয়ে পঞ্চাশ টাকার আরাম ভোগ করবে, সেটা নেহাতই দুরাশা।

আবাসনের ভেতরের রাস্তাগুলোতে জোরালো টিউব লাইট জ্বলছে। এই আলোটা কলকাতা কর্পোরেশনের মহানুভবতা।

গেট থেকে সোজা যে রাস্তাটা ভেতরে ঢুকে গেছে তাব বাঁ পাশে সাত নম্বর বিল্ডিংয়ের দোতলায় সঞ্চারীদের ফ্ল্যাট। সেখানে এসে বাইরে থেকে কলিং বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিলেন রত্নময়ী। সঞ্চারীর মা।

রত্নময়ীর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন। এই বয়সেও তাঁর চুল বেশির ভাগই কালো। ভাসা ভাসা চোখের তলায় শুকনো শ্যাওলার মতো কালচে ছোপ। একসময় লম্বাটে ভরাট মুখ ছিল। এখন গাল ভেঙে ভেতরে অনেকটা ঢুকে গেছে। চিবুক আর কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। হাতের শিরাগুলো বড় বেশি প্রকট। ত্বকের মসৃণতা আর নেই; সরু সরু লক্ষ কোটি রেখায় ছেয়ে গেছে। কেমন যেন জালি জালি মনে হয়। চোখে মুখে, তাকানোর ভঙ্গিতে নরম ভাব নেই। সারা চেহারা জুড়ে অদ্ভুত রুক্ষতা। আধময়লা, হালকা রঙের একটা শাড়ি ঘরোয়া ঢংয়ে পরা। গলায় সুতোর মতো সরু সোনার চেইন, হাতে একগাছা করে ব্রোঞ্জের ওপর সোনার পাতের চুড়ি। গয়নাগাটি যা ছিল, আগেই সব গেছে। এই সোনাটুকুই তাঁর শেষ সম্বল। এক নজরেই টের পাওয়া যায়, মহিলার ওপর দিয়ে প্রচুর ঝড়ঝাপটা গেছে।

রত্নময়ী মেয়ের দিকে দু-এক পলক তাকিয়ে একধারে সরে দাঁড়ালেন। আপাতত একটি কথাও বললেন না। সঞ্চারী নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে গেল। সে জানে, রোজ রোজ এত রাত করে মেয়ের বাড়ি ফেরাটা তাঁর আদৌ পছন্দ নয়। পরে এই নিয়ে উগরে দেবেন তাঁর তীব্র অসন্তোষ, বিরক্তি। এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

ভেতরে ঢুকলেই বড় হলের মতো জায়গা। তার অর্ধেকটা গদিওলা বেতের সোফা, ডিভান, সেন্টার টেবল, ক'টা মোড়া ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। বাকি অংশে রয়েছে খাবার টেবল এবং চারটে চেয়ার। এককোণে একটা রঙিন টিভি। সব মিলিয়ে এটা ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম। তিন-চার বছর আগেও সোফা-টোফা কিছুই ছিল না। না টিভি, না ডাইনিং টেবল। বসার জন্য ক'টা সস্তা কেঠো চেয়ার, একটা খেলো তক্তপোশ। খাওয়া-দাওযার ব্যবস্থা মেঝেতে বসে। সঞ্চারী এন জি ও'তে চাকরি পাওয়ার পর এসব হয়েছে।

ফ্ল্যাটটা প্রায় হাজার স্কোয়ার ফিটের মতো। হলের ডান দিকটায় পর পর তিনটে বেডরুম। দু'টো বড়, একটা মাঝারি। তাছাড়া রয়েছে কিচেন, দু'টো ঘরের লাগোয়া ব্যালকনি, দু'টো বাথরুম, ইত্যাদি। সঞ্চারীদের পক্ষে যথেষ্ট—যথেষ্ট। হাত-পা ছড়িয়ে আয়েশ করে থাকা যায়। মাসের শেষে এজন্য তারা যা টাকা দেয়, কলকাতায় কেন, অনেক দূরে হাড়োয়া সন্দেশখালিতেও এর দশ ভাগের এক ভাগ বাসস্থান পাওয়া যাবে না। বাবা নেহাত কত বছর আগে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিলেন, তাই কলকাতার এই জমকালো এলাকায় এতগুলো ঘর-টর নিয়ে তারা থাকতে পারছে।

আগে সারাক্ষণ সরগরম থাকত ফ্ল্যাটটা। কত লোকজন তখন! বাবা, মা, এক বিধবা পিসি, ছোট বোন বিনি, ছোট ভাই রণ্টু, এক মাসতুতো দাদা মাধব আর সঞ্চারী নিজে। বেশির ভাগই মরে-ঝরে শেষ। মাধব চাকরি পেয়ে সেই কবে কোচিনে চলে গেছে। এখানকার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না। অথচ তাকে কাছে রেখে, স্কুল কলেজে পড়িয়ে, বি. কম পাশ করিয়েছেন তার বাবা। সে যে এতটা অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন হবে, কে ভাবতে পেরেছিল! এই ফ্ল্যাটে এখন তিনটে মাত্র প্রাণী—রত্নময়ী, সঞ্চারী আর রণ্টু।

সঞ্চারীর হাতে একটা জুটের ব্যাগে রয়েছে হট কেসটা, কাঁধ থেকে ঝুলছে সুদৃশ্য আরও একটা লেডিজ ব্যাগ। কিচেনে জুটের ব্যাগটা রেখে কোনাকুনি হল পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তার চোখে পড়ল, রণ্টু ওর ঘরে কম্পিউটার চালিয়ে কী করছে। হয়তো প্র্যাকটিস।

রণ্টুর বয়স বাইশ। মাধ্যমিকে দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছিল। চারটে সাবজেক্টে লেটার পেয়ে স্টার। তার পরেই ডানা গজাল। বাজে কিছু বন্ধুবান্ধব জুটল তার। আড্ডা, হুল্লোড়বাজি, সিনেমা, ভিডিও ইত্যাদিতে মেতে উঠল। মাধ্যমিকের

রেজাল্ট অত ভালো হয়েছে, রণ্টু ভেবেছিল উচ্চ মাধ্যমিকটাও তুড়ি মেরে পেরিয়ে যাবে এবং একই রকম চোখ ধাঁধানো রেজাল্ট হবে।

কিন্তু মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিকে অনেক তফাত। অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট কোর্স শেষ করতে হয়।

সেভাবে ঘাড় গুঁজে না পড়লে কিছু হয়? হাতে কি জাদুকাঠি আছে যে সেটা ঘোরালেই যা চাও তাই পেয়ে যাবে? ফলে যা হবার তাই হল। হায়ার সেকেন্ডারিতে টায়টোয় সেকেন্ড ডিভিসন। এই যখন হাল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া তো অলীক কল্পনা। কত স্বপ্ন ছিল রত্নময়ীর, সঞ্চারীর। সব ভেঙেচুরে খান খান। মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর রুক্ষ মাটিতে আছড়ে পড়ল রণ্টু। শুধু কি সে-ই, গোটা পরিবারটাই। সেকেন্ড ডিভিসনের নিচের দিকে থেকে নাম-করা কলেজে অ্যাডমিশন পাওয়া অসম্ভব। হন্যে হয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে শেষ অব্দি খুব সাধারণ কলেজে জায়গা পাওয়া গেল। তাও অনার্স নয়, নেহাতই পাস কোর্সে।

দামি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে রণ্টু। বিশাল ক্যাম্পাস ছিল সেখানে। কলকাতার বিরাট বিরাট ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরা ওই স্কুলে পড়তে আসে। কী চমৎকার পরিবেশ। নিয়মিত ক্লাস ছাড়াও আরও কত কিছু হত। নানা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি। ডিবেট, এক্সকারসন, স্পোর্টস, নাটক।

এই ধরনের স্কুলে পড়ানোর বিপুল খরচ। সঞ্চারীদের মতো ফ্যামিলির পক্ষে নিতান্তই দুরাশা। কিন্তু তার বাবা শিবতোষ নন্দী সংসার খরচ কিছুটা কাটছাঁট করে, অফিসে ওভারটাইম খেটে, রণ্টুকে ওখানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ছেলেটার পড়াশোনায় মাথা আছে। নিশ্চয়ই একদিন দাঁড়িয়ে যাবে। এটা শিবতোষের ইনভেস্টমেন্টই বলা যায়—বিনিয়োগ। ছেলে দাঁড়ালে তার পেছনে যা খরচ হবে তার লক্ষ গুণ উঠে আসবে। তাঁদের সব কষ্টের, সব অনটনের অবসান ঘটবে। সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। শেষ জীবনটা বিলাসে না হোক, আরামে কেটে যাবে। আর্থিক দিক থেকে সমস্ত টেনশনের মুক্তি। শিবতোষের বহুকালের ইচ্ছা, দক্ষিণ ভারতে এবং উত্তর ভারতে বেড়াতে যান। এতকাল সংসারের জাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য ছিল না। রণ্টু দাঁড়িয়ে গেলে প্রাণ ভরে শখ মিটিয়ে নেবেন।

সেই ছেলেকে কিনা সেন্ট্রাল ক্যালকাটার ঘিঞ্জি এলাকায় মস্ত বাজারের মাঝখানে একটা কলেজে ভর্তি হতে হল! পুরনো সেকেলে বিল্ডিং। দেওয়ালে

দেওয়ালে পলিটিক্যাল স্লোগান, চারদিকে হাজারটা পোস্টার। পাশ থেকে উঠে আসে বাজারের অবিরল হইচই, চিৎকার, কলেজের ভেতরটাও বাইরের বাজারের মতোই। কত যে ছাত্রছাত্রী তার লেখাজোখা নেই। অন্য কলেজে যাদের ঠাঁই হয় না, এখানে তাদের জন্য দরজা হাট করে খোলা। সারাক্ষণ চেঁচামেচি, উৎকট হট্টগোল। দশ-বিশ দিন পরপর স্ট্রাইক, নইলে মিছিল করে ময়দানে যাওয়া। সব স্বপ্নের বিসর্জন ঘটে গিয়েছিল শিবতোষদের। এমন একটা ধাক্কা যে লাগবে, কেউ কি ভাবতে পেরেছিল!

দামি স্কুল থেকে ওইরকম একটা কলেজে গিয়ে মন বসছিল না রণ্টুর। তাই কখনও বসে? চূড়ান্ত ফ্রাস্ট্রেশন—অপার হতাশা। প্রায়ই ক্লাস করত না। কাছাকাছি পার্কে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। একটা বছর ফাইনাল পরীক্ষাই দিল না, পরের বছর বসল বটে, কিন্তু দু'টো সাবজেক্ট দিয়ে আর গেলই না। তারপর কলেজ ছেড়েই দিল। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকত। ঝিমধরা, মনমরা, বিমর্ষ। তার সব এ[illegible] ইচ্ছাশক্তি ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। রত্নময়ী আর সঞ্চারী কত বোঝাল, দু'টো বছর নষ্ট হয়েছে তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি। নতুন করে শুরু করুক রণ্টু। চেষ্টা করলে কী না হয়? কিন্তু কে কার কথা শোনে! রণ্টুর গোঁ, সে আর পড়বে না। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে একটা নামী কম্পিউটার সেন্টারে ভর্তি করে দিল সঞ্চারী। ওখান থেকে সার্টিফিকেট পেলে কল সেন্টার-টেন্টারে চাকরি-বাকরি হওয়া সম্ভব। বাড়িতে প্র্যাকটিসের জন্য একটা কম্পিউটারও কিনে দেওয়া হল। ব্যাঙ্ক থেকে এজন্যে লোন নিতে হয়েছে সঞ্চারীকে। মাসে মাসে ইনস্টলমেন্টে তা শোধ করতে হয়।

নিজের ঘরে এসে আলো জ্বালল সঞ্চারী। একটা সিঙ্গল-বেড খাট, ওয়ার্ডরোব জাতীয় ক্যাবিনেট, বইয়ের র‍্যাক, ছোট একটা ড্রেসিং টেবল, আলনা, পড়ার টেবল—সব মিলিয়ে মোটামুটি ছিমছাম।

কাঁধের লেডিজ ব্যাগটা পড়ার টেবলে রেখে চটপট আলনা থেকে একটা ঢোলা ম্যাক্সি আর তোয়ালে নিয়ে অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে গেল সঞ্চারী। গায়ের সালোয়ার-কামিজ ঘামে, রাস্তার ধুলোয় আর গাড়ির ধোঁয়ায় চিটচিট করছে। এগুলো ছাড়তে না পারলে স্বস্তি নেই।

বাইরের পোশাক ছেড়ে একধারে রেখে দিল সঞ্চারী। কাল সকালে তাদের কাজের মেয়ে সরস্বতী এসে ওগুলো কেচে দেবে। রোজই দেয়।

সাবান মেখে মিনিট পনেরো-কুড়ি ধরে স্নান করল সে। তারপর গা-মাথা

মুছে ম্যাক্সি পরে বেডরুমে চলে এল। ঠাণ্ডা জলে ম্যাজিক থাকে। স্নানটা তার সারাদিনের ক্লান্তি লহমায় মুছে দিল। এখন নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগছে।

সে ড্রেসিং টেবলের সামনে গিয়ে বসল। আয়নায় যে তরুণীটির মুখ ফুটে উঠেছে তার বয়স আটাশ পেরুলেও তেইশের বেশি মনে হয় না। সঞ্চারীর কেমন যেন ধন্দ লাগে, ওই প্রতিবিম্ব কি তারই? রত্নময়ীর মতো না হলেও তার জীবনেও ওলটপালট কম কিছু হয়নি। কত যে সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে! অদৃশ্য কোনও দানব গলা টিপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তাকে অতল খাদে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল সব শেষ, সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। তারপর কত কষ্টে, কত ধৈর্যে যে অন্ধকার পাতাল থেকে উঠে আসতে পেরেছে, সে-ই শুধু জানে। তার তো চুরমার হয়ে যাবার কথা। কিন্তু ভাঙচুরের কোনও ছাপই পড়েনি চেহারায়। আটাশ-উনত্রিশেও সে এক তরতাজা, পরমাশ্চর্য যুবতী। তার মধ্যে রয়েছে অফুরান এনার্জি, বিপুল জীবনীশক্তি এবং নাছোড়বান্দা এক গোঁ। যত বাধাই আসুক, যত বিপত্তি, সব রুখে দেবার মতো জেদ তার মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণে।

গা, মাথা ভালো করেই মুছেছিল সঞ্চারী। তবু পোখরাজের ছোট ছোট দানার মতো চুলে, কপালে এবং গালে এবং গলার ভাঁজে কিছু কিছু জলকণা এখনও লেগে আছে। হাতের কাছেই তোয়ালে রয়েছে। ইচ্ছা করলে মুছে নিতে পারে, কিন্তু মুছল না। সেগুলো ভারি আরাম দিচ্ছিল তাকে। আয়নার দিকে সে তাকিয়ে রইল পলকহীন। কখনও কখনও নিজেকে দেখতে ভালোই লাগে।

হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে রণ্টুর গলা ভেসে এল, 'দিদি, মা খেতে ডাকছে—'

মুখ ফিরিয়ে সঞ্চারী বলল, 'এক্ষুনি যাচ্ছি—'

রণ্টু চলে গেল।

সঞ্চারী দ্রুত বারকয়েক চুলে চিরুনি চালিয়ে উঠে পড়ল। হল-ঘরে ডাইনিং টেবলে এসে দেখল রত্নময়ী স্টেনলেস স্টিলের থালায় খাবার সাজিয়ে বসে আছেন। রণ্টুকেও সেখানে দেখা গেল।

রাত্তিরে রণ্টু ভাত খায়। সঞ্চারী আর রত্নময়ী রুটি। রত্নময়ী একসঙ্গে খান না। ছেলেমেয়ের খাওয়া হয়ে গেলে খেতে বসেন।

আজকের রাতের মেনু বেগুনভাজা, নারকেল কুচি দিয়ে ছোলার ডাল, পাঁচমেশালি একটা তরকারি আর রুইমাছ। স্বামী মারা যাবার পর রত্নময়ী মাছ-

মাংস ছেড়ে দিয়েছেন। পুরোপুরি নিরামিষাশী, কিন্তু ছেলেমেয়ের জন্য রাঁধতে হয়।

রণ্টু ঘাড় গুঁজে খাচ্ছিল। সে নিজের থেকে কারও সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না। কিছু জিগ্যেস করলে 'হ্যাঁ' বা 'না' করে জবাব দেয়। খুবই সংক্ষেপে। অথচ একসময় কী হাসিখুশিই না ছিল! হইচই করে সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখত। আর সেই ছেলেই পুরোটা শক্ত খোলার ভেতর নিজেকে পুরে ফেলেছে। ও যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করত, অনেকখানি হালকা বোধ করত সঞ্চারী। ক'বছর ধরে রণ্টুর জন্য কম চেষ্টা করছে! সমানে উৎসাহ দিয়ে চলেছে তাকে। তার ভেঙে-পড়া আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে অবিরত। কিন্তু শেষ অব্দি কী হবে কে জানে।

রুটির একটা টুকরো ছিঁড়ে তরকারি দিয়ে চিবুতে চিবুতে কয়েক লহমা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সঞ্চারী। তারপর জিগ্যেস করে, 'তোর কম্পিউটার ক্লাস কিরকম হচ্ছে?'

চকিতে মুখ তুলেই ফের নামিয়ে নেয় রণ্টু। আবছা গলায় বলে, 'হচ্ছে একরকম—'

'বাড়িতে এসে ঠিকমতো প্র্যাকটিস করছিস তো?'

'করছি—'

'ভালো রেজাল্ট কিন্তু করা চাই।'

'দেখি—'

কোনওরকম চাড় নেই, এমনভাবে জবাব দিচ্ছে রণ্টু। কতভাবে ওকে বুঝিয়েছে সঞ্চারী। সবরকম হতাশা যাতে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে সেজন্য সাহস জুগিয়ে গেছে। কিন্তু সবসময় ছেলেটা নিরুদ্যম। জীবনের সমস্ত কিছু যেন শেষ হয়ে গেছে ওর।

সঞ্চারী বলল, 'চাকরির জন্য কম্পিউটারের সঙ্গে ইংরেজিতে কমিউনিকেশন স্কিলটা ভীষণ ইমপর্টান্ট। তুই অবশ্য ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছিস। তবু একটা স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে ভর্তি হলে ভালো হয়।'

রণ্টু চুপ করে থাকে।

তার দিকে একটু ঝুঁকে সঞ্চারী জিগ্যেস করে, 'আমি কি খোঁজ নিয়ে দেখব, কোথায় খুব যত্ন করে শেখায়?'

রণ্টু উত্তর দিল না।

সঞ্চারী বলতে লাগল, 'ব্রিটিশ ইন্সটিটিউট, রামকৃষ্ণ মিশনে ইংরেজিতে কোর্স করে অনেক ছেলেমেয়ে কল সেন্টারগুলোতে ভালো ভালো চাকরি পেয়েছে। আমি দু'একদিনের ভেতর খবর নিয়ে আসি। তারপর তোর যেখানে পছন্দ সেখানে ভর্তি করে দেব।'

রণ্টু ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'এখন থাক—'

আগেও এ-জাতীয় কথাবার্তা হয়েছে রণ্টুর সঙ্গে। আজকাল ছেলেমেয়েরা এখানে ভর্তি হচ্ছে, ওখানে ভর্তি হচ্ছে। এটা শিখছে, ওটা শিখছে। চাকরি-বাকরির ব্যাপারে কখন কোনটা কাজে লাগে তার কি কিছু ঠিক আছে? কিন্তু নিজের কেরিয়ার, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে লেশমাত্র আগ্রহ নেই রণ্টুর।

মনটা খারাপ হয়ে গেল সঞ্চারীর। টেবলের এক কোনায় বসে তীক্ষ্ণ চোখে ছেলে আর মেয়েকে লক্ষ করতে লাগলেন রত্নময়ী।

নিঃশব্দে খাওয়া চলছে। আচমকা রত্নময়ী জিগ্যেস করলেন, 'আজ কী হল ভবানীপুরে? কী চাইছে অমরনাথবাবুরা?'

সঞ্চারী বিরক্ত হচ্ছিল। তার ভাইয়ের মতো এমন গা-ছাড়া, উদ্যমহীন ছেলে আর একটিও দেখে নি। ওকে বলা আর পাথরের দেওয়ালকে বলা সমান। শুধু শুধু খানিকটা বক বক করে যাওয়া।

রণ্টুর ভাবনাটা মাথার ভেতর পাক খাচ্ছিল। ত্বরিৎ মায়ের দিকে ঘুরে বসল সঞ্চারী। ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী বলছ তুমি!'

'শুনলিই তো।'

'তোমাকে পাঁচ দিন ধরে বলে যাচ্ছি, অফিসে গিয়ে ঢুকলে পৃথিবী রসাতলে গেলেও অন্য কিছু ভাবার, কোথাও যাবার সময় পাই না। রাত্তিরে সাড়ে আটটার পর বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে আসি। কি, বলিনি?'

'তা বলেছিস।' বলে রত্নময়ী অদ্ভুত একটু হাসলেন।

মা যে তার কথা বিশ্বাস করেনি, সেটা খুবই স্পষ্ট। রত্নময়ী তেমনি হাসছিলেন। জ্বালা-ধরানো হাসি। হঠাৎ মাথায় আগুন ধরে গেল সঞ্চারীর। এক ঝটকায় শরীরটা টেনে তুলে ফেলল সে। 'আমার মোবাইলটা নিয়ে আসছি। ভবানীপুরে ধরে দিচ্ছি। ওঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখ, সত্যিই গেছি কিনা—'

রত্নময়ী হাত তুলে নরম গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, ফোন আনতে হবে না। খাওয়ার সময় উঠতে নেই। বোস—'

মায়ের মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে ফের বসে পড়ে সঞ্চারী।

কিছুক্ষণ নীরবে খাওয়া চলে। একসময় রত্নময়ী ডাকেন, 'রুমি—'

'বল—'

'বলব?' প্রশ্নটা করে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর রত্নময়ী শুরু করলেন, 'শুনলেই তো ফোঁস করে উঠবি।'

চোখের দৃষ্টি খর হয়ে ওঠে সঞ্চারীর।—'ফোঁস করার মতো কিছু বলবে নাকি?'

বিরস সুরে রত্নময়ী বললেন, 'আমি যা বলি তাতেই তো রেগে উঠিস। কোন কথাটা তোর ভালো লাগবে, কোনটা খারাপ, কী করে বুঝব? আমি কি মুখ দেখে তোর মাথায় কী আছে টের পাই?'

হঠাৎ মায়ের প্রতি মনটা মমতায় ভরে যায়। এই মহিলাটি কম দুঃখকষ্ট ভোগ করেন নি। অনেক সময় তাঁর প্রতি রূঢ় হয়ে ওঠে সঞ্চারী। পরে অনুশোচনাও হয়। মৃদু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, কী বলতে চাও বল—'

রত্নময়ী বললেন, 'এ ক'দিন অফিসের কাজের চাপে যেতে পারিসনি, কিন্তু আবার যাবি তো?'

ভবানীপুরে তার যাতায়াতটা রত্নময়ী একেবারে সহ্য করতে পারেন না। বহুবার তিনি মেয়েকে বারণ করেছেন। মায়ের প্রায় সব কথাই সে শোনে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারেনি সঞ্চারী। এক কথা রোজ রোজ শুনতে কি ভালো লাগে? সমস্ত দিন অফিসে নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। মারাত্মক খাটুনি তার সব এনার্জি শুষে বার করে নিয়েছিল। তারপর বাড়ি ফিরে মায়ের খোঁচা-দেওয়া কথায় মেজাজ তেতো হয়ে গেল। তবু নিজের মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শান্ত স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, যাব।'

'কী মতলব তোর?'

'কিসের মতলব?'

'অমরনাথবাবুরা কি চান, তুই ওঁদের ওখানে গিয়ে থাকিস।'

এরকম একটা সংশয় মায়ের মাথায় গেঁথে বসে গেছে। ব্যাপারটা স্রেফ রত্নময়ীর মনগড়া। আগাগোড়া মিথ্যে। আসলে তার কোনও ভিত্তিই নেই।

সঞ্চারী কণ্ঠস্বরে কোমল ভাবটা চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারছিল না। একটু ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল, 'কক্ষনো না। যে বাড়ি থেকে চিরকালের মতো চলে এসেছি সেখানে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। তুমি জানো না, ওই দু'টো অসহায় মানুষকে আমি ছাড়া দেখার আর কেউ নেই? তাই যেতে হয়।'

'তুই ছাড়া ওঁদের বুঝি কেউ নেই? আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব?'

'তারা কী ধরনের মানুষ, তোমাকে বলেছি। সব স্বার্থপর, নিষ্ঠুর। মায়ামমতা বলতে কিচ্ছু নেই।' সঞ্চারী বলতে লাগল, 'তুমি রোজ এক কথা বলে যাবে। আমাকে এক উত্তর দিতে হবে। ভালো লাগে? তুমিই বল—'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ভবানীপুরে সঞ্চারীর শ্বশুরবাড়িটা ফিক্সেশনের মতো আটকে গেছে রত্নময়ীর মাথায়।

চোখ কুঁচকে কিছু ভাবলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তাহলে যতদিন ওঁরা বেঁচে থাকবেন, তোকেই দেখাশোনা করতে হবে?'

কথাগুলো শুনতে খুবই সাদামাঠা। কিন্তু তার ভেতর লুকনো রয়েছে সূক্ষ্ম সব অস্ত্র। সঠিক লক্ষ্যে সেগুলো বিঁধে যাচ্ছিল। সঞ্চারী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে নিল, আজ স্বর চড়াবে না। সত্যিই চড়াল না। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'জোর করে কিছু কি বলা যায়? তবে যতদিন পারি দেখব।'

এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করলেন না রত্নময়ী। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'হ্যাঁ রে, সেই ছেলেটার কী খবর?'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সঞ্চারী। খাচ্ছিল নিঃশব্দে। কোন ছেলেটা সম্বন্ধে রত্নময়ী জানতে চাইছেন, ঠিক ধরতে পারেনি। মায়ের দিকে ফিরে বলল, 'কোন ছেলেটা?'

'ওই যে দিল্লিতে চলে গেছে।'

ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট হল। রত্নময়ী দীপকের কথা বলছেন। তাঁর আরেকটা ফিক্সেশন দীপক। পলকহীন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সঞ্চারী। এই মহিলাটি কত বদলে গেছেন! সারাক্ষণ তাঁর সংশয়, নাকি ভয়, সঞ্চারী যে কোনও দিন তাঁদের অথৈ সমুদ্রে বিসর্জন দিয়ে দিল্লি চলে যাবে।

একটা মানুষের ভেতর কত যে গোপন ঝাঁপি লুকনো থাকে! তার কোনওটায় রয়েছে মমতা, কোনওটায় তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা, কোনওটায় অপার সহানুভূতি, কোনওটায় স্বার্থপরতা। সুদিনে যে মানুষকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবদূত মনে হয়, দুঃসময়ে সে-ই আগাগোড়া পালটে যায়। তার ভেতরকার অদৃশ্য ঝাঁপিগুলোর ঢাকনা খুলে বেরিয়ে আসে কুটিল সন্দেহ, ক্রোধ, প্রবল বিদ্বেষ।

মা যে তাকে ভালোবাসেন না তা নয়। জয়দীপের সঙ্গে ডিভোর্সের সময় ডানা মেলে তিনি তাকে আগলে রেখেছিলেন। এখন তাঁর হাত শূন্য। জমানো একটা পয়সা নেই। গয়নাগাটি প্রায় সবই চলে গেছে। নামমাত্র যা আছে তা

দিয়ে পনেরো দিনও চলবে না। সঞ্চারীই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। সে চলে গেলে কিভাবে চলবে? কী খাবেন? তাই মেয়েকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

মায়ের মনোভাবটা বুঝতে পারে সঞ্চারী। রণ্টু এখনও দাঁড়াল না, কেমন একটা জড়ভরত মার্কা হয়ে যাচ্ছে। কবে দাঁড়াবে, আদৌ দাঁড়াবে কিনা, কে জানে। এমন একটা পরিস্থিতিতে ওদের ফেলে চলে যাবে, অতখানি অমানুষ এখনও হয়ে যায়নি সে। কিন্তু মা তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। আসলে ক্রমাগত ধাক্কা খেতে খেতে কারওকে বিশ্বাস করার মতো মানসিকতাই নষ্ট হয়ে গেছে।

রত্নময়ী বললেন, 'কী রে, কিছু বললি না তো?'

ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিল সঞ্চারী। সামান্য চমকে উঠে বলে, 'কী বলব? দীপক দিল্লিতেই আছে।'

'এর ভেতর তোকে ফোন করেনি?'

'না।'

চোখের তারা স্থির হয়ে যায় রত্নময়ীর। ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললেন, 'সত্যি বলছিস?'

সঞ্চারী ঠিকই টের পায়, মায়ের এই আপাত সরল, নিষ্পাপ মুখের আড়ালে আরও একটি মুখ রয়েছে। সন্দিগ্ধ, অবিশ্বাসী, কুটিল মুখ। সারা শরীর চিড়বিড়িয়ে ওঠে তার। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিল, মেজাজটাকে চড়তে দেবে না। সেটার লাগাম শক্ত মুঠোয় ধরে রাখল। গলার স্বর আরও শীতল করে বলল, 'আমার সেল ফোনটা এনে দীপককে ধরিয়ে দিচ্ছি। আমাকে ফোন করেছিল কিনা, ওকে জিগ্যেস করে জেনে নাও।'

সঞ্চারী উঠে পড়েছিল, তার হাত ধরে ফের বসিয়ে দিতে দিতে রত্নময়ী বললেন, 'ঠিক আছে, ঝঞ্ঝাট করার দরকার নেই। ছেলেটা ভাববে, মা হয়ে আমি তোকে সন্দেহ করি। ছি ছি! তুই এখন খা—'

মন তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল। মুখের মতো একটা জবাব দেওয়া যেত কিন্তু তাতে অশান্তি বেড়ে যাবে। সারাদিনের পরিশ্রমে হাড়মাংস থেঁতো হয়ে গেছে। স্নায়ুমণ্ডলী আলগা হয়ে আসছে। এই মধ্যরাতে এখন গৃহযুদ্ধ ভালো লাগছে না। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে। সে আবার খেতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রত্নময়ী খুব আস্তে ডাকলেন, 'রুমি—'

সঞ্চারী মুখ তুলল। ভুরু কুঁচকে মাকে দেখতে লাগল।

হাসি হাসি মুখ করে রত্নময়ী বললেন, 'হয়তো ক'দিন ফোন করতে পারেনি দীপক, কিন্তু করে তো—'

মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সঞ্চারীর। কিন্তু সে আজ ঠিকই করে ফেলেছে, তিক্ততার মাত্রাটাকে বাড়তে দেবে না। বলল, 'করে। নিশ্চয়ই করে। আর তুমি তা ভালো করেই জানো। আমি তোমার কাছে কিছুই গোপন করিনি।'

'কী চায় সে?'

যতই সঞ্চারী ভেবে থাকুক, শান্তির ব্যাঘাত ঘটতে দেবে না, ভেতরকার ঝাঁঝ খানিকটা হলেও বেরিয়ে এল, 'কী চায়, বুঝতে পার না? তুমি কি বাচ্চা মেয়ে যে এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিসুদ্ধি হয়নি?'

এমন সোজাসুজি, এত স্পষ্ট করে আগে কখনও বলেনি সঞ্চারী। রত্নময়ীর মুখটা নিমেষে রক্তশূন্য হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, ম্লান। কিছু একটা বলতে চাইলেন, গলায় স্বর ফুটল না। ঠোঁট দু'টো কাঁপতে লাগল থরথর।

রত্নময়ীকে দেখতে দেখতে গ্লানিতে মন ভরে গেল সঞ্চারীর। এটা কী করল সে? অনুতাপের শেল কেউ যেন বিঁধিয়ে দিতে লাগল তার মাথায়। মা তো আগে এমনটা ছিলেন না। তার বিয়ের আগে পর্যন্ত মায়ের শান্ত, হাসিখুশি, মায়াময় মুখচ্ছবি কোনও কোনও বিজন মুহূর্তে এখনও চোখের সামনে সে দেখতে পায়। সেই রত্নময়ী কত দ্রুত পালটে গেলেন! আপাদমস্তক। তিনি এখন কলহপটু এক মহিলা, সারাক্ষণ উগ্র মেজাজ, সন্দেহের বিষে মস্তিষ্কটি বোঝাই। কারণটা অজানা নেই সঞ্চারীর। অনুশোচনায় পুড়তে পুড়তে সে প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়ে। মায়ের একটি হাত ধরে মিনতির সুরে বলতে থাকে, 'মা, আমাকে ক্ষমা কর। রাগের মাথায় কী বলে ফেলেছি!' একটু চুপ করে থেকে সে বলে, 'আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে?'

রত্নময়ী উত্তর দিলেন না।

সঞ্চারী বলল, 'এখনও দীপক স্পষ্ট করে আমাকে কিছু বলে নি। হয়তো কোনও দিন বলবে, হয়তো বলবে না। আমি ঠিক জানি না। তবে বুঝি ও আমাকে পছন্দ করে।'

রত্নময়ী এবারও নীরব। তিনি জবাব দিলেন না। তাঁর ঠোঁট দু'টো কাঁপতেই লাগল।

ব্যাকুল সুরে সঞ্চারী সমানে বলে যেতে থাকে, 'আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে মা। তুমি কেমন করে ভাবলে, তোমাকে আর রন্টুকে ফেলে রেখে আমি চলে যাব? এ কখনও হতে পারে? তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না।'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফোটে রত্নময়ীর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুকনো বিমর্ষ মুখে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তুই এখন খেয়ে নে—' একটু থেমে বলেন, 'আমি রাগ করে থাকব না। হল তো?'

আজকের মতো একটা সন্ধি হল ঠিকই, কিন্তু সেটা কতটা ক্ষণস্থায়ী, কতখানি পলকা, সঞ্চারী তা ভালো করেই জানে।

॥ তিন ॥

খাওয়া শেষ হলে নিজের ঘরে চলে এল সঞ্চারী। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। শরীর জুড়ে অনন্ত অবসাদ, শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। সারাদিন একটানা ধকলের পর খাওয়ার টেবিলে সন্দেহবাতিক মায়ের সঙ্গে কখনও ঠাণ্ডা লড়াই, কখনও মেজাজ তিক্ত হয়ে যাওয়া—সব মিলিয়ে স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে আছে। কতদিন এমনটা চলবে, কে জানে। পাঁচ বছর, দশ বছর, না কি আমৃত্যু?

ধীরে ধীরে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়ে সঞ্চারী। অন্ধকার বেডরুমে কোথায় কী আছে—আলমারি, ছোট ড্রেসিং টেবল, বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবল—সব তার মুখস্থ। খাট থেকে নেমে আলমারি-টালমারির ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে ডান দিকে চলে এল সে। এই ঘরের দু'টো দরজা। একটা বাঁ পাশে, সেটা দিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরে যাওয়া যায়। ওটা রাত্তিরে খোলাই থাকে। কিন্তু ডান পাশে যে দরজাটা আছে, সন্ধে হলেই সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওধারে রয়েছে ছোট একটা ব্যালকনি।

ডান দিকের দরজা খুলে ব্যালকনিতে চলে এল সঞ্চারী। রেলিংয়ের ওপর দুই কনুই রেখে সামনে তাকায় সে। এ পাশটা আবাসনের ভেতরের অংশ। চারধারে প্রচুর গাছপালা। এধারে ওধারে সারি সারি বিল্ডিংগুলোর ফাঁক দিয়ে পিচের যেসব রাস্তা চলে গেছে, তার গা ঘেঁষে খানিকটা পর পর কর্পোরেশনের ল্যাম্পপোস্ট। সেগুলো অকাতরে আলো বিতরণ করে চলেছে।

বারোটা প্রায় বাজতে চলল। এই মধ্যরাতে মনে হয় না, কেউ কোথাও

জেগে আছে। কমপ্লেক্সের বিল্ডিংগুলোর দু-একটা জানালায় আলো চোখে পড়ে। বাকি সব অন্ধকার। এই আবাসন এখন ঘুমের আরকে ডুবে গেছে। আলোয় আঁধারে মেশা এ যেন এক পরিত্যক্ত, ভূতুড়ে এলাকা। তবে বড় রাস্তার দিক থেকে মাঝে মাঝে দু-চারটে গাড়িটাড়ির আওয়াজ ভেসে আসছে।

মাথার ওপর বিশাল আকাশ জুড়ে কত যে নক্ষত্র! আজ কী তিথি, কে জানে। আকাশের এক কোণে ক্ষয়ে-যাওয়া এক ফালি চাঁদ স্থির হয়ে আছে, সিনেমার কোনও ফ্রিজ শটের মতো।

সঞ্চারী কিছুই লক্ষ করছিল না। হঠাৎ হঠাৎ কোনও কোনও নির্জন রাতে, সমস্ত চরাচর যখন নিস্তব্ধ, এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিজের অতীতটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেয় সে। অদৃশ্য তোরঙ্গের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে পড়ে কত ধরনের স্মৃতি—ভাল, মন্দ, তিক্ত, কটু।

বাবা তখনও বেঁচে, সে সোশিওলজিতে সবে এম এ পরীক্ষাটা দিয়েছে, সেই সময় এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়েছিল। সেখানে জয়দীপের সঙ্গে আলাপ। আলাপ থেকে বন্ধুত্ব থেকে উতরোল প্রেম এবং তারপর বিয়ে, মাত্র দেড় মাসের ভেতর ব্যাপারটা ঘটে গেল।

জয়দীপ বনেদি বংশের ছেলে। লেখাপড়ায় চৌখস। এম বি এ। ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা, ভবানীপুরে বিশাল বাড়ি ছাড়াও আরও ক'টা বাড়ি আছে কলকাতার নানা এলাকায়। একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে বিরাট পোস্টে রয়েছে। চোখধাঁধানো পে-প্যাকেট। তার মতো অতি সাদামাঠা, মিডল ক্লাস ফ্যামিলির একটা মেয়েকে কেন দুম করে ভালোবেসে বিয়ে করে ফেলল, তা নিয়ে সেদিন কিছু ভাবেই নি সঞ্চারী। একটা স্বপ্নের ঘোরে ছিল সে। মনে হচ্ছিল, স্বপ্নের উড়ানে চড়ে পৃথিবীর ধুলোমাটি থেকে অনেক উঁচুতে মহাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। জানা গেল, জয়দীপের প্রচুর বান্ধবী। 'ফুলে ফুলে মধু খাওয়া' বলে একটা পুরনো কথা আছে; জয়দীপ সেই টাইপের। প্রথম প্রথম তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। হাবে ভাবে চালচলনে জয়দীপ বুঝিয়ে দিয়েছে, একটি টগবগে যুবক যার অঢেল টাকা, মস্ত চাকরি, বিপুল সম্পত্তি, স্ত্রীর পায়ে পায়ে পোষা কুকুরের মতো ঘুরঘুর করবে, এটা হয় নাকি? এমন বিদঘুটে কথা ভূ-ভারতে কেউ কখনও শুনেছে? এক নারী নিয়ে কেউ জীবন কাটিয়ে দেবে, এটা একেবারেই 'মিডল ক্লাস মেন্টালিটি'।

সঞ্চারীর কাকুতি-মিনতি, চোখের জল, কিছুই তোয়াক্কা করেনি জয়দীপ। তুড়ি মেরে সমস্ত উড়িয়ে দিয়েছে।

এরপর শুরু হয়েছিল খিটিমিটি. চিৎকার, চেঁচামেচি, কুৎসিত কলহ। গোটা ব্যাপারটা চরম পর্যায়ে পৌঁছল যখন একটি গুজরাতি মেয়েকে নিয়ে বাঙ্গালোরে পালিয়ে গেল জয়দীপ। তলায় তলায়, কাউকে বুঝতে না দিয়ে বাঙ্গালোরের একটা কোম্পানিতে যোগাযোগ করেছিল। চাকরিটা পাওয়ামাত্র আর দেরি করেনি।

শোনা যায়, ক্বচিৎ কারও জীবনে রূপকথার মতো কিছু ঘটে। সঞ্চারীর জীবনেও ঘটেছিল কিন্তু কয়েক লহমার জন্য। তারপরেই সেটা চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে।

সঞ্চারীর আত্মমর্যাদা বোধ প্রখর। জয়দীপ আবর্জনার মতো তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে, আর 'শ্বশুরবাড়ি মেয়েদের স্বর্গ, মেয়েদের একমাত্র অবলম্বন'—এমন আদ্যিকালের ধ্যানধারণা নিয়ে সে সেখানে পড়ে থাকবে তা অসম্ভব। যেদিন জয়দীপের বাঙ্গালোরে যাবার খবরটা শুনতে পেল সেইদিনই টালিগঞ্জে ফিরে আসে সঞ্চারী। অমরনাথ এবং প্রতিমা অনেক বুঝিয়েছিলেন, জয়দীপ দুশ্চরিত্র, কুলাঙ্গার। বংশের মুখে সে চুনকালি লেপে দিয়েছে। তার সঙ্গে তাঁরা কোনও সম্পর্ক রাখবেন না। সে চলে গেছে তো আপদ গেছে। কিন্তু সঞ্চারী কেন তাঁদের ছেড়ে যাবে? অমরনাথরা জানিয়েছেন, সসম্মানে তাকে মাথায় করে রাখবেন। ভবানীপুরের বাড়িতে তার পূর্ণ অধিকার। কিন্তু কোনও কথা শোনেনি সঞ্চারী। তবে কথা দিতে হয়েছিল, সে ভবানীপুরে গিয়ে অমরনাথদের দেখে আসবে, পারলে রোজই।

টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে তখন লোকজন অনেক কমে গেছে। পিসির মৃত্যু হয়েছে। ছোট বোন বিনি একটা তামিল ছেলের সঙ্গে মাদ্রাজ (এখনকার চেন্নাই) পালিয়ে গেছে। সেখানে তারা বিয়ে-টিয়ে করে সুখেই আছে। বাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না। মাসতুতো দাদা মাধবও চাকরি পেয়ে কোচিনে চলে গেছে। লোকটা আদ্যোপান্ত স্বার্থপর। কোচিনে চলে যাবার পর চিঠি লিখে বা একটা ফোন করেও সঞ্চারীদের খোঁজ নেয় না। অথচ তার জন্য কী না করেছে তারা? বিশেষ করে তার বাবা। মাধব বুঝিয়ে দিয়েছে, পৃথিবীতে কারও জন্য কিছু করতে নেই। করলে কষ্টই পেতে হয়।

বাড়িতে তখন সবসুদ্ধ চারজন। বাবা, মা, রণ্টু আর সঞ্চারী। বাবা রিটায়ার

করেছেন কিন্তু শরীর ঠিকঠাক নেই। প্রায়ই পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পান। ওষুধ-টোষুধ খেলে কিছুদিন কম থাকে, তারপর আবার সেটা চাড়া দিয়ে ওঠে।

সঞ্চারীর বাবা শিবতোষ নন্দী মাঝারি ধরনের চাকরি করলেও মানুষটি বেশ তেজী, তাঁর শক্ত একটা মেরুদণ্ড ছিল। সঞ্চারীর আত্মসম্মান বোধটা তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। মেয়ের মুখে জয়দীপের কুকীর্তির কথা সবিস্তার শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। চিৎকার করে বলেছেন, 'কালই হারামজাদার নামে ডিভোর্সের মামলা করব।' রেগে গেলে তাঁর মাথার ঠিক থাকত না। মুখ দিয়ে লাভাস্রোতের মতো অবিরল বেরিয়ে আসত—শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা, ইত্যাদি।

সঞ্চারীও হুবহু তা-ই ভেবেছিল। জয়দীপের সঙ্গে ফিনফিনে সরু সুতোয় যে সম্পর্কটা তখনও ঝুলে আছে, চিরতরে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। কোর্টের রায়ে পাকাপাকি বিচ্ছেদ চাই। কিন্তু রত্নময়ী সেকেলে ধরনের মহিলা। তিনি মনে করেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা স্বর্গীয় বন্ধন। সেটা একটুকরো বাজে কাগজ নয় যে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেললাম কিংবা ভঙ্গুর কাচ নয় যে আছাড় মেরে চুরমার করলাম। সঞ্চারী আর শিবতোষ বরং বাঙ্গালোরে চলে যাক, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসুক। রত্নময়ীর স্থির বিশ্বাস, ঝোঁকের মাথায়, সাময়িক মোহে একটা গর্হিত কাজ করে ফেলেছে জয়দীপ। হয়তো সেজন্য সে অনুতপ্তও। কিন্তু সঙ্কোচে ফিরে আসতে পারছে না। সঞ্চারী সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে।

ব্যঙ্গের সুরে ঝাঁঝিয়ে উঠেছেন শিবতোষ।—'ওই জানোয়ারটা কি কোলের বাচ্চা যে বাবা-বাছা বলে বোঝালেই বুঝবে? বাঙ্গালোর গেলে আমাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। এই বদমাশ লম্পটের সঙ্গে রুমির কোনও রকম সম্পর্ক রাখতে দেব না।'

এরপর শুরু হয়েছিল কেস। এবং সেটা একতরফা। কোর্টের সমন পেয়ে একবারও হাজির হয়নি জয়দীপ। সে নিশ্চয়ই চাইছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়ে যাক।

এদিকে শরীর দ্রুত খারাপ হয়ে যাচ্ছিল শিবতোষের। নানা পরীক্ষা-টরীক্ষার পর ধরা পড়েছিল প্যানক্রিয়াস অর্থাৎ অগ্ন্যাশয়ে ক্যানসার। যা জমা টাকা ছিল অপারেশন করাতে গিয়ে প্রায় সব শেষ। শুধু তাই নয়, রত্নময়ীর গয়নাগাটি যা ছিল বিক্রি করে দিতে হয়েছে। তবু শিবতোষকে বাঁচানো যায়নি।

মামলায় অবশ্য জিতে গেছে সঞ্চারী। বিবাহ-বিচ্ছেদটাও আইনের দিক থেকে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু জয়দীপের সঙ্গে সমস্ত কিছু চুকেবুকে গেলেও ভবানীপুরের সঙ্গে সম্পর্কের একটা গিঁট তখনও থেকে গেছে। সঞ্চারী রাখতে চায়নি, অমরনাথরাই তাকে আঁকড়ে ধরে আছেন। জয়দীপ তাঁদের একমাত্র ছেলে, সে চলে গেছে। দু'জন বয়স্ক মানুষকে বিশাল বাড়িতে অসহায় অবস্থায় থাকতে হচ্ছে। রোজ দু'বার তিনবার ফোন করেন অমরনাথ বা প্রতিমা। বলেন, সে গেলে ওঁরা মানসিক দিক থেকে অনেকখানি জোর পান। সঞ্চারীকে তাই যেতেই হচ্ছে।

অমরনাথদের হাজারটা সমস্যা। দু'জনই পুরোপুরি সুস্থ নন। বয়স হলে যা হয়—ব্লাডসুগার, হাই প্রেসার, ইউরিক অ্যাসিডের বাড়বাড়ন্ত, হার্টের গোলমাল ইত্যাদি ইত্যাদি। তার ওপর যেটা মারাত্মক—দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে কিছু আত্মীয়-পরিজন ছেঁকে ধরেছে। নানা কূটকৌশলে অমরনাথদের কাছ থেকে টাকাপয়সা সোনাদানা বাগিয়ে নিতে চায়। বিপুল সম্পত্তি ওঁদের। কলকাতায় বেশ ক'টা বাড়ি। সেগুলো লিখিয়ে নিতে চাইছে তারা। এদের ঠেকানোর জন্য ঢাল হিসেবে সঞ্চারীকে দরকার। সঞ্চারী এখন আর তাঁদের কেউ নয়, কিন্তু অমরনাথরা মনে করেন সে-ই সব চেয়ে আপনজন, সে-ই তাঁদের রক্ষা করতে পারবে।

এদিকে টালিগঞ্জের সংসার প্রায় অচল। উইডো পেনশন হিসেবে রত্নময়ী যে ক'টা টাকা পান তাতে দশ দিনের খরচও চলে না। সঞ্চারী কখনও চায়নি, হাত পাতাটা তার ধাতেই নেই। কিন্তু অমরনাথরা জানেন কোন দুরবস্থার মধ্যে ওদের দিন কাটছে। প্রথম প্রথম আভাসে ইঙ্গিতে, পরে স্পষ্ট করেই বলেছেন, ওঁরা একটা মোটা অঙ্কের টাকা সঞ্চারীকে দিতে চান। সঞ্চারী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, কোনও প্রত্যাশা নিয়ে সে ভবানীপুরে যায় না। একটি ঘষা পয়সাও সে নিতে পারবে না। টাকার কথা তুললে অমরনাথদের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেবে।

সোশিওলজি নিয়ে এম. এ করেছিল সঞ্চারী। রেজাল্ট মোটামুটি ভালোই হয়েছে। কিন্তু জয়দীপের সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যাওয়ার আগে চাকরি-বাকরির কথা ভাবেনি। কিন্তু ডিভোর্স, বাবার মৃত্যু—একের পর এক ঘটনা ঠেলতে ঠেলতে তাকে একটা খাদের কিনারায় নিয়ে এসেছিল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে তার কাজ চাই, চাই মাসের শেষে বেশ কিছু টাকা। নইলে মা এবং ভাইকে নিয়ে তাদের সংসার পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।

মাকে বাড়ির কাজে কিছুটা সাহায্য করা, আর অমরনাথদের নানা ঝক্কি সামলানোর ফাঁকে ফাঁকে চাকরির জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছিল সঞ্চারী। কিন্তু তার এম. পি মামা নেই, মিনিস্টার জামাইবাবু নেই বা সে কোনও রুলিং পার্টির পাকা খাতায় নামও লেখায়নি যে চাইলেই একটা চাকরি পেয়ে যাবে।

এর সঙ্গে তার সঙ্গে দেখা করে, কলকাতার বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট আর অফিস পাড়ায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ছুটে যখন সে ক্লান্ত, হতাশ হয়ে পড়েছে, সেই সময় চাকরি জুটে গেল। একেবারে অপ্রত্যাশিত। পৃথিবীতে মিরাকল এখনও ঘটে।

রথতলায় এক কলেজের বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল সঞ্চারী। তার স্বামী একটা বড় প্রাইভেট কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। যদি সে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারে সেই আশায় যাওয়া। বন্ধুর স্বামী খুবই ভদ্র, বিনয়ী, সহানুভূতিশীল। বিব্রতভাবে জানিয়েছিল, তাদের কোম্পানি যে-সব এমপ্লয়ীর এখনও সাত আট বছর চাকরি আছে তাদের ভি. আর. এস ধরাচ্ছে, নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্টের কোনও প্রশ্নই নেই। তবে বায়ো-ডাটা রইল। তাদের অফিস ছাড়া কি আর কোনও অফিস নেই? সে সঞ্চারীর জন্য চেষ্টা করে দেখবে। বন্ধুও ভরসা দেবার সুরে বলেছে, নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়ে যাবে। সঞ্চারী যেন ভেঙে না পড়ে। ওদের আশ্বাসটা ফাঁকা আওয়াজ নয়, তাতে যথেষ্ট আন্তরিকতার সুরই ছিল।

ম্লান হেসে বেরিয়ে এসেছিল সে। অফুরান আশা নিয়ে যেখানেই দৌড়ে যায়, শূন্য হাতে তাকে ফিরতে হয়। আরও একবার তাকে নিরাশ হতে হল। ব্যাপারটা ক্রমশ গা-সওয়া হয়ে উঠছিল।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ উঁচু কম্পাউন্ড ওয়াল দিয়ে ঘেরা বিশাল একটা এলাকা সঞ্চারীর চোখে পড়েছিল। টানা দেওয়ালের উপর তারকাঁটার টানা বেড়া। রাস্তার দিকে গেটের মাথায় মস্ত সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা : আশ্বাস।

গেটের একটা পাল্লা হাট করে খোলা। তার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়েছিল, ভেতরে অনেকগুলো বাড়ি। কোনওটা একতলা, কোনওটা দোতলা।

সঞ্চারীর কৌতূহল হয়েছিল। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছে। গেটের মুখে একটা বিশাল আকারের উর্দি-পরা দারোয়ান শিরদাঁড়া টান টান করে দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে রাইফেল।

দারোয়ান হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে জিগ্যেস করেছে, 'ইঁহা কোঙ্গকো খুঁজছেন দিদিজি?'

লোকটার চেহারা যতই ভীতিকর হোক না, গলার স্বর ভারি নরম। তার চোখ মুখ খুঁটিয়ে লক্ষ করে মনে হয়েছে বেশ ভালোমানুষ। সঞ্চারী জানতে চেয়েছে, 'এটা কি কোনও অফিস?'

'জি, হাঁ—'

অফিসের নাম 'আশ্বাস'! রীতিমতো অবাকই হয়েছে সঞ্চারী।—'কিসের অফিস?'

'দুখী লেড়কীরা এখানে থাকে।'

দারোয়ান বিশদভাবে যা জানিয়েছিল, সেটা মোটামুটি এইরকম। বাপ-মা আত্মীয়-পরিজন যে মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি, দূষিত জীবাণুর মতো যাদের ত্যাগ করেছে, 'আশ্বাস'-এ তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বয়ম্ভর হতে পারে, সেজন্য যত্ন করে হাতের রকমারি কাজ শেখানো হয়।

সমস্ত ব্যাপারটা সঞ্চারীর মাথায় কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। দারোয়ানের চোখের দিকে তাকিয়ে সে জানতে চেয়েছিল, এখানকার মেয়েদের আপনজনেরা কেন তাদের বর্জন করেছে?

বিপুল চেহারার দারোয়ান প্রশ্নটা শোনামাত্র কুঁকড়ে গিয়েছিল। হাতজোড় করে মিনতির সুরে বলেছে, 'এ বাত দয়া করে দুবারা (দু'বার) পুছবেন না। আমার মুহ্ (মুখ) দিয়ে এর জবাব বেরুবে না।'

সঞ্চারীর বিস্ময়ের মাত্রাটা শতগুণ বেড়ে গেছে। এ নিয়ে সে আর কিছু জিগ্যেস করেনি। কিছুক্ষণ ভেবে বলেছে, 'এখানে অনেক লোকজন কাজ করে?'

'হাঁ। লগভগ তিশ চাল্লিশ জন তো হবেই।'

সঞ্চারী আঁচ করে নিয়েছে, দারোয়ানের অঙ্কের হিসেবটা গোলমেলে। তার কাছে তিরিশও যা, চল্লিশও তা-ই।

দারোয়ান ফের বলেছে, 'আপনার মতো দিদিজিরাই বেশি কাজ করে, পাঁচ দশজন দাদাবাবু ভি আছে।'

অর্থাৎ মহিলা কর্মীদের সংখ্যা বেশি, পুরুষরা সেই তুলনায় অনেক কম। হয়তো কাজের কাজ কিছুই হবে না, তবু কপাল ঠুকে একবার দেখাই যাক

না—এইরকম একটা চিন্তা আচমকা সঞ্চারীর মস্তিষ্কে ঢুকে যায়। সে জিগ্যেস করেছে, 'এই অফিসটা কে চালান?'

দারোয়ান বলেছে, 'বড়ীদিদি—মাল্‌বিকাজি। মাল্‌বিকা রুদ্দর—'

বোঝা গেল, নামটা মালবিকা রুদ্র। দারোয়ানের উচ্চারণে ওইরকম বিদঘুটে চেহারা নিয়েছে। সঞ্চারী বলেছিল, 'আমি তোমার বড়ীদিদির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

দারোয়ান একটু থমকে গেছে। তারপর বিব্রতভাবে বলেছে, 'বড়ীদিদি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। আগে থেকে 'অ্যাপনমিন' (অ্যাপয়েন্টমেন্ট) না করে আচানক গিয়ে হাজির হলে বহুৎ বিরক্ত হবেন।'

সঞ্চারী অনেক করে বুঝিয়েছে, দশ মিনিটের বেশি সময় নেবে না। দারোয়ান বলেছে, 'আপনাকে যেতে দিলে বড়ীদিদি আমার ওপর গুস্‌সা করবেন।'

'আমি তাঁকে বলব তোমার কোনও দোষ নেই। আমিই জোর করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি।'

সঞ্চারীকে হয়তো দারোয়ানের ভালো লেগেছিল। দ্বিধা কাটিয়ে সে রাজি হয়ে যায়।—'ঠিক আছে, আপনি অন্দর যান দিদিজি। লেকেন দেখবেন আমি যেন ঝামেলায় না পড়ি—'

'না না, আমি বড়দিদিকে বুঝিয়ে বলব—'

গেট পেরুলেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে চার-পাঁচটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তার কোনওটা জিপ, কোনওটা ম্যাটাডোর, কোনওটা লম্বা ধরনের ভ্যান, একটা অ্যামবাসাডর, ইত্যাদি।

বাইরে থেকে ক'টা বাড়ি চোখে পড়েছিল। ফাঁকা জায়গাটার পর প্রথম দোতলা বিল্ডিংয়েই 'আশ্বাস'-এর মূল অফিস। তিন-চারজন নানা বয়সের মহিলা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। সঞ্চারীর মনে হয়েছিল, ওরা এখানকার কর্মী। তাদের জিগ্যেস করতে জানিয়ে দিয়েছে, দোতলায় দক্ষিণ দিকের শেষ কামরাটা মালবিকা রুদ্রের।

ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এসেছিল সঞ্চারী। দক্ষিণের শেষ প্রান্তের ঘরটা বিশাল। একটা দেওয়াল জুড়ে কাচের পাল্লা দেওয়া সারি সারি আলমারি। সেগুলো নানা ধরনের বইপত্র এবং ফাইলে ঠাসা। অন্য তিন দেওয়াল ঘেঁষে লম্বা লম্বা র‍্যাক। সেগুলোতেও থাকে থাকে অজস্র ফাইল।

ঘরের মাঝখানে মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবল। তার ওপর ফাইলের পাহাড়, দু'টো ফোন, রাইটিং প্যাড, কম্পিউটার, পেপার ওয়েট, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন মহিলা টেবলের ওপর ঝুঁকে একটা বিরাট ফাইলে ডুবে ছিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাঁধ অব্দি ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুল, ভরাট মুখ। এই বয়সেও টান টান মসৃণ ত্বক, টকটকে রং। চোখে হালকা ফ্রেমের চশমা। শরীর একটু ভারী ধরনের। বয়সের কারণে খানিকটা মেদ জমেছে। একসময় মহিলা যে আশ্চর্য রূপসী ছিলেন তা এখনও আঁচ করা যায়।

ইনিই যে মালবিকা রুদ্র, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না সঞ্চারীর। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালবিকাকে লক্ষ করছিল সে। তিনি মুখ তুললে তাকে দেখতে পারেন, তখন কথা বলবে।

কিন্তু মালবিকা কোনও দিকেই তাকাচ্ছেন না, ফাইলেই মগ্ন হয়ে আছেন।

সঞ্চারী একটু নার্ভাস বোধ করছিল। ওই অবস্থায় গলায় শব্দ-টব্দ করে তাঁর নজরে পড়ার চেষ্টা করলে, কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য মালবিকা কতটা বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট হবেন, সেটা আন্দাজ করতে পারছিল না। একবার ভেবেছে, ফিরেই যায়। দোনামনা করতে করতে হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। কী আর করবেন মহিলা? রূঢ় গলায় তাকে চলে যেতে বলবেন, হতাশার সংখ্যাটা আরও একটু লম্বা হবে, এর বেশি তো আর কিছু নয়।

যতটা সম্ভব গলার স্বর নীচু করে একসময় সঞ্চারী ডাকে, 'ম্যাডাম—'

ডাকটা কানে গিয়েছিল মালবিকার। চোখ তুলে একটি অচেনা মেয়েকে দেখে অবাকই হয়েছেন। বলেছেন, 'কী চান?'

'আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

'আসুন—' সঞ্চারী ঘরে ঢুকলে মালবিকা টেবলের এ-পাশের চেয়ারগুলো দেখিয়ে তাকে বসতে বলেছেন। তারপর জিগ্যেস করেছেন, 'আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

ভদ্রমহিলা বেশ গম্ভীর, তাঁর চেহারায় কণ্ঠস্বরে প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ। সঞ্চারী বলেছিল, 'হ্যাঁ, ম্যাডাম। আমাকে দয়া করে দশ মিনিট সময় যদি দেন—'

'আমি এক্সট্রিমলি বিজি।' বলে কী একটু ভেবেছেন মালবিকা। হয়তো সঞ্চারীর চোখেমুখে এমন কিছু ছিল—কাকুতি-মিনিত, ব্যাকুলতা বা আর্তি—যা তাঁকে সামান্য হলেও নাড়া দিয়েছে। বলেছেন, 'ঠিক আছে, আপনার কথা শোনা যাক—'

'আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট। আপনি করে বলছেন। খুব সঙ্কোচ হচ্ছে—'

মৃদু হেসেছেন মালবিকা।—'আচ্ছা আচ্ছা, বল—'

নিজের সম্বন্ধে বিশদভাবে সমস্ত কিছু জানিয়েছিল সঞ্চারী। বিবাহ-বিচ্ছেদ, পারিবারিক অবস্থা থেকে শুরু করে তারা যে উপোস দিয়ে মরার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, কিছুই বাদ দেয়নি।

শুনতে শুনতে অপার সহানুভূতিতে মন ভরে গিয়েছিল মালবিকার। বাইরে কঠোর একটা আবরণ থাকলেও, তাঁর ভেতরে নরম, সহৃদয় একটা মানুষ লুকনো রয়েছে, সেটা টের পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'স্যাড, ভেরি স্যাড—'

একটু চুপচাপ।

তারপর মালবিকা বলেছেন, 'এবার বল, তুমি আমাকে এসব শোনালে কেন?'

'আপনাকেই শুধু না, আরও অনেককেই আমার কথা শুনিয়েছি। কারণ একটাই, যদি করুণা করে কেউ চাকরি-টাকরির ব্যবস্থা করে দেন।'

'তোমার হঠাৎ কেন মনে হল আমি তোমাকে চাকরি দিতে পারি?'

কারণটা বুঝিয়ে দিয়েছিল সঞ্চারী। সামনের বড় রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে 'আশ্বাস'-এর সাইনবোর্ড দেখে দারোয়ানকে জিগ্যেস করে সে জানতে পারে, এটা একটা অফিস এবং এখানে অনেকে কাজ করে। সঞ্চারী আরও জেনেছে, মালবিকা রুদ্র 'আশ্বাস'-এর সর্বেসর্বা। যদি কিছু জুটে যায় সেই আশায় সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

মালবিকা বলেছেন, 'এটা কিসের অফিস, কী ধরনের কাজকর্ম এখানে হয়, তুমি কি জানতে পেরেছ?'

'দারোয়ান বলছিল, এখানে দুঃখী মেয়েরা থাকে, হাতের কাজটাজ শেখে—এইসব।'

'কী ধরনের দুঃখী, দারোয়ান বলেছে?'

'এদের বাড়ির লোকজনেরা নাকি মেয়েগুলোকে ত্যাগ করেছে। দে আর অল ডেজার্টেড উইমেন। কেন মা-বাবা বা রিলেটিভরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না তা অবশ্য জানায়নি।'

'দারোয়ানের পক্ষে জানানো সম্ভব ছিল না।'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থেকেছে সঞ্চারী। কী বলবে ভেবে পায়নি।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর অনেকখানি নামিয়ে মালবিকা বলেছিলেন, 'যাদের এখানে শেলটার দেওয়া হয়েছে তারা সব রেপ ভিকটিম। ধর্ষিতা মেয়ে।'

সঞ্চারী চমকে উঠেছে। এবারও কোনও উত্তর দেয়নি।

মালবিকা থামেননি।—'আমরা পাশে না দাঁড়ালে ওদের জায়গা হত ব্রথেলে। কেউ কেউ আত্মহত্যাও হয়তো করত। শিয়াল শকুনেরা চারপাশে ওত পেতে আছে। এই মেয়েদের অনেককেই তারা বেচে দিত হরিয়ানায়, মুম্বাই কি দিল্লিতে।'

সঞ্চারীর বিমূঢ় ভাবটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। 'আশ্বাস'-এর বাসিন্দা প্রতিটি মেয়েই যে ধর্ষণের শিকার, এটা ভাবতে পারেনি সে।

মালবিকা বলেই যাচ্ছিলেন, 'এই জাতীয় মেয়েদের শারীরিক মান-সম্ভ্রমই শুধু নষ্ট হয় না, মানসিক দিক থেকেও তারা খান খান হয়ে যায়। ভাবে, আর বেঁচে থাকার মানে হয় না। পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে তারা নিজেদের গুটিয়ে রাখতে চায়। 'আশ্বাস'-এর একটা বড় কাজ হল, দিনের পর দিন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, কাউন্সেলিং করে, এদের মনের জোর, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। যা ঘটে গেছে সেজন্যে তারা দায়ী নয়। কোনও পাপ, কোনও অন্যায় তারা করে নি। বিষাক্ত জন্তু শরীরে ছোবল বসিয়েছে বলে জীবনটাই ধ্বংস হয়ে যায় না— অবিরল এই সব বলে বলে তাঁদের সুস্থ করে তোলা। তারপর নানা কাজের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা যাতে দুর্ঘটনার স্মৃতি, গ্লানিবোধ ধীরে ধীরে মুছে যায়। স্বনির্ভর হয়ে তারা বেঁচে থাকতে পারে।'

একটানা বলার পর কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন মালবিকা। একসময় মৃদু হেসে ফের শুরু করেছেন, 'বুঝতেই পারছ, আমাদের কাজটা ভেরি, ভেরি ডিফিকাল্ট।' অফিসে গিয়ে কেরানিগিরি করলাম, কি স্কুল-কলেজে ছাত্র পড়ালাম, সে সবের সঙ্গে কোনও মিলই নেই। আমাদের যা হ্যান্ডেল করতে হয় তা হল, মানুষের মন নামে ভীষণ জটিল একটা গোলকধাঁধা। লজ্জা, যন্ত্রণা, অন্যায় না করেও তীব্র পাপবোধ, এই সব একাকার হয়ে ধাক্কা মারতে মারতে যে মেয়েদের খাদের কিনারে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে, তাদের ফিরিয়ে আনা যে কত কঠিন সেটা প্রতি মুহূর্তে আমরা টের পাই।'

অস্পষ্টভাবে কিছু একটা উত্তর দিয়েছিল সঞ্চারী, এতকাল বাদে আর মনে নেই।

টেবলের ওপর খানিকটা ঝুঁকে মালবিকা এবার বলেছেন, 'তোমার জন্যে আমাদের এখানে একটা কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। ইন ফ্যাক্ট আমাদের চার-পাঁচ জন লোক দরকারও। তবে—'

অফিসে অফিসে এত ছোটাছুটি, নানা জায়গায় বায়ো-ডাটা পাঠানো, একে তাকে ধরাধরি, কত কিছুই তো করেছে সঞ্চারী, কিন্তু সেই প্রথম একটু আশার সংকেত চোখে পড়েছিল। রুদ্ধশ্বাসে সে জিগ্যেস করেছে, 'তবে কী?'

'তোমাকে আমাদের অবস্থাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার। 'আশ্বাস' একটা এন জি ও। নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন। নানা জায়গা থেকে আমরা গ্রান্ট, ডোনেশন পাই। স্টেট আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও কিছু টাকাপয়সা দেয়। আমাদের পক্ষে ভালো স্যালারি দেওয়া সম্ভব নয়। আপাতত আমরা হাজার চারেক টাকার মতো অ্যালাওয়েন্স দিতে পারি।'

সঞ্চারীর কাছে চার হাজার তখন চার লক্ষের চাইতেও বেশি। সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ব্যগ্রভাবে বলেছে, 'আমি রাজি।'

মালবিকা বলেছিলেন, 'আমার আরও কিছু বলার আছে।'

অপ্রত্যাশিত যে সুযোগটা হঠাৎই পাওয়া গেছে সেটা কি হাতছাড়া হয়ে যাবে? পলকের জন্য হৃৎস্পন্দন থেমে গিয়েছিল সঞ্চারীর। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করেছে, 'কী বলবেন?'

'আমাদের সোসাইটি এখনও তেমন উদার নয়। আমাদের পা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে পড়েছে ঠিকই কিন্তু মাথাটা রয়েছে নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে। মানুষ এখনও কুসংস্কার, পুরনো ধ্যানধারণা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

মালবিকা ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন, সঞ্চারীর মাথায় তা ঢুকছিল না। বিহ্বলের মতো সে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

মালবিকা থামেননি।—'তুমি তো শুনেছই, যে মেয়েদের নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে তারা রেপ ভিকটিম। তোমার মা, ভাই, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীরা যখন এটা জানতে পারবেন, তাঁদের রি-অ্যাকশন কিন্তু মারাত্মক হবে।'

সঞ্চারী বলেছে, 'যা হবার হোক, এই কাজটা আমার চাই। দেওয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গেছে ম্যাডাম।'

স্নিগ্ধ গলায় মালবিকা বলেছেন, 'তাড়াহুড়োর দরকার নেই। সবার সঙ্গে কথা বলে, তাঁদের মতামত নিয়ে তবে কাজটা নিও। তোমার বায়ো-ডাটা সঙ্গে আছে?'

ঐকগোছা বায়ো-ডাটা সারাক্ষণ তার ব্যাগেই থাকত। কখন দরকার হবে, কেউ কি বলতে পারে? ব্যাগ থেকে একটা বার করে মালবিকাকে দিয়ে উঠে পড়েছে সে।

মালবিকা জানতে চেয়েছেন, 'তোমাদের টেলিফোন আছে?'

ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল সঞ্চারীর মুখে। সে বলেছে, 'আমাদের অবস্থার কথা তো সবই বলেছি ম্যাডাম। টেলিফোন রাখা কি সম্ভব?'

বিব্রতভাবে মালবিকা বলেছেন, 'আই অ্যাম সরি। কিছু মনে কোরো না। কোনও কনট্যাক্ট নাম্বার দিতে পার?'

সঞ্চারীদের পাশের ফ্ল্যাটটা সুকুমার সান্যালের। ওঁদের একটা ফোন আছে। সুকুমার তার বাবার বন্ধু, সঞ্চারীকে খুবই পছন্দ করেন। তিনি বলেই রেখেছেন, দরকারমতো তাঁদের ফোনটা যেন সে ব্যবহার করে। খুব জরুরি কারণ ছাড়া সঞ্চারী কখনও তা করে না। তবে সুকুমারবাবুদের নাম্বারটা অনেককে দিয়ে রেখেছে। ওখানে ফোন করলে তিনি বা তাঁর স্ত্রী তাকে তক্ষুনি ডেকে দেয়। বাইরে থেকে ফোন এলে তো বিল বাড়বে না। সুকুমাররা এই সাহায্যটুকু যে করেন সেজন্য সঞ্চারী খুবই কৃতজ্ঞ। ওঁদের ফোন নাম্বারটা একটা কাগজে লিখে মালবিকাকে দিয়েছিল সে।

মালবিকা বলেছেন, 'সাত দিন পর আমি তোমাকে ফোন করব। এর ভেতর সবার সঙ্গে কথা বলে নিও।'

মনে পড়ে, বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ নিজের ঘরে চুপচাপ বসে ছিল সঞ্চারী। অন্যমনস্ক। ভেতরে তুমুল আলোড়ন চলছিল। চাকরি পেতে চলেছে, সেই উত্তেজনায়, খুশিতে অন্য দিকগুলো খুঁটিয়ে দেখেনি সে। মালবিকার কথাগুলো বার বার কানে বাজছিল। ঠাণ্ডা মাথায় নির্জন ঘরে ভাবতে ভাবতে মনে হয়েছিল, মালবিকা ঠিকই বলেছেন। কাদের নিয়ে তার কাজ, কাজের পরিবেশটা কেমন, এটা জানাজানি হলে দু-চার জন ছাড়া তাদের আবাসনের সবারই ভুরু কুঁচকে যাবে। যেসব কটু, নোংরা মন্তব্য তারা করবে, শুনলে মনে হবে, এরকম একটা চাকরির চেয়ে মৃত্যুও অনেক শ্রেয়। উৎকণ্ঠায় সঞ্চারীর মন ভরে যাচ্ছিল। এ তো গেল প্রতিবেশীদের কথা। তার মা কিভাবে ব্যাপারটা নেবেন সেটাও ভীষণ দুশ্চিন্তা সঞ্চারীর। সেকেলে মানুষ। মাথাটা নানা ধরনের পচা গলা সংস্কারে ঠাসা। হয়তো বলে বসবেন, না খেয়ে মরবেন তবু ওই জাতীয় মেয়েদের সংসর্গে যেন সঞ্চারী কোনও ভাবেই না যায়।

নানা চিন্তা চারদিক থেকে যখন সঞ্চারীকে ঠেসে ধরেছে সেই সময় রত্নময়ী ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। বলেছেন, 'কি রে, এভাবে বসে আছিস! হাতমুখ ধুলি না, বাইরের কাপড়-চোপড় ছাড়লি না—কী হয়েছে?' তাঁকে রীতিমতো উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

সঞ্চারী বলেছে, 'বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

সঞ্চারী তার খাটের এক কোনায় বসে ছিল। আরেক প্রান্তে ধীরে ধীরে বসে পড়েছেন রত্নময়ী। চোখ মেয়ের দিকে। টের পাওয়া যাচ্ছিল, তাঁর উদ্বেগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

সঞ্চারী বলেছিল, 'আমি একটা চাকরি পেতে পারি।'

সংসারে নানা বিপর্যয়ের কারণে রত্নময়ীর চোখেমুখে সারাক্ষণই হয় বিরক্তি, নইলে বিষাদ লেগেই থাকে। তার সঙ্গে সেই মুহূর্তে ছিল উদ্বেগ। সঞ্চারীর কথা শোনামাত্র লহমায় সব ধুয়ে মুছে সাফ। খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল তাঁর মুখ। বলেছেন, 'চাকরি পাবি, এ তো আনন্দের কথা। তা থুম মেরে আছিস কেন?'

'আগে সবটা শুনে নাও।'

'বল—'

কোথায়, কী ধরনের চাকরি জুটতে পারে, কত মাইনে, বিশদভাবে জানিয়ে দিয়েছিল সঞ্চারী। জানতে চেয়েছিল, 'ভেবেচিন্তে বল, আমার কী করা উচিত?'

কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন রত্নময়ী। তারপর বলেছেন, 'বেশি কিছু ভাবার নেই। আমাদের সংসারের যা হাল, চাকরিটা তুই নিবি। এখন বাছবিচার করার মতো অবস্থায় আমরা নেই। যেখানে কাজ করতে যাচ্ছ সেখানে নিজেকে শক্ত রাখতে হবে। সেই সঙ্গে অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টাও চালিয়ে যাবি। ভালো কিছু জুটলে এটা ছেড়ে দিস।'

সঞ্চারী হতবাক। তার ধারণা ছিল, মায়ের দিক থেকে প্রবল বাধা আসবে। কিন্তু অভাবে অনটনে সংসার চালাতে তাঁর হাড়-মাংস থেঁতো হয়ে যাচ্ছে। আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, পৃথিবীর আলো বাতাস যেন ক্রমশ কমে আসছিল। দমবন্ধ-করা পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য হাতের সামনে যা পাওয়া গেছে, সেটা আঁকড়ে ধরা উচিত। মা যে সেই সার সত্যটা বুঝতে পেরেছেন, তাতে সঞ্চারী যতটা খুশি হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক। তবে নিজেকে অনেকখানি হালকা লেগেছে তার। রত্নময়ী ঠিকই বলেছেন, আপাতত পায়ের তলায় যে জমিটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা যেমনই হোক, খোয়ানো ঠিক হবে

না। প্রয়োজনটা যখন নিজেদের, চাকরিটা কী ধরনের তা নিয়ে খুঁতখুঁতুনির মানে হয় না।

রত্নময়ী সতর্ক করে দিয়েছেন, 'কী চাকরি করছ, কাদের নিয়ে তোমার কাজ, কারওকে বলার দরকার নেই। জানিসই তো মানুষের জিভে বিষ থাকে। ছোবল দেবার জন্যে তারা ফণা তুলেই আছে।'

সঞ্চারী জিগ্যেস করেছে, 'কী কাজ করি, কেউ যদি জানতে চায়?'

'এত লেখাপড়া শিখেছিস। কিছু একটা বানিয়ে বলতে পারবি না?'

সাতদিন বাদে মালবিকা সুকুমার সান্যালদের ফ্ল্যাটে ফোন করে জানতে চেয়েছেন, 'কী ঠিক করলে?'

সঞ্চারী বলেছে, 'আমি কাজটা নেব।'

'সবার মতামত নিয়েছ তো?'

শুধু রত্নময়ীর সঙ্গেই তার কথা হয়েছে। অন্য কারও সঙ্গে আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না। খানিকটা সত্যি, খানিকটা মিথ্যে মিশিয়ে সঞ্চারী বলেছে, 'হ্যাঁ।'

'গুড। তোমার মতো শিক্ষিত মেয়েকে আমাদের দরকার। নেক্সট উইকে জয়েন করতে পারবে?'

'পারব।'

প্রথমে সঞ্চারীকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছিল তা হল কাউন্সেলিং। যে ধর্ষিত মেয়েরা মানসিক দিক থেকে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে তাদের পরম মমতায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, নানারকম পরামর্শ দিয়ে, স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। কিন্তু এই জাতীয় কাজ সম্পর্কে তার লেশমাত্র ধারণা ছিল না। তাই মালবিকা সপ্তাহ তিনেক তাকে নিজে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। কর্মপদ্ধতির খুঁটিনাটি যত্ন করে শিখিয়েছেন। সঞ্চারী যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। কাজটা বুঝে নিতে তার লেশমাত্র অসুবিধা হয়নি।

মাস ছয়েক 'প্রশ্বাস'-এর মেয়েদের কাউন্সেলিংয়ের পর তাকে এর পাশাপাশি অন্য ডিউটিও দিয়েছিলেন মালবিকা। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, মেয়েটা ফাঁকিবাজ বা গবেট নয়। একজন অত্যন্ত দক্ষ কর্মী। ব্যক্তিত্ব তো আছেই, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতাও রয়েছে।

সপ্তাহে ছ'দিন ওয়ার্কিং ডে। মালবিকা সঞ্চারীর কাজটা দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। চারদিন সে কাউন্সেলিং করবে। বাকি দু'দিন নানা সরকারি দপ্তর এবং বেসরকারি অফিসে ডোনেশন বা গ্রান্টের জন্য ছোটাছুটি করবে। কোনও

কোনও জায়গা থেকে মাসের প্রথম সপ্তাহেই গ্রান্ট এসে যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গড়িমসি ভাব। তাগাদা না দিলে সহজে পাওয়া যায় না।

এইভাবে ঘোরাঘুরি করতে করতে দীপকের সঙ্গে তার আলাপ। দীপকের বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ। বেশ সুপুরুষ, চোখেমুখে বুদ্ধির ঝলক।

একটা বিরাট কোম্পানির বড় ডিপার্টমেন্টের সে ম্যানেজার। ওদের সোশাল ওয়েলফেয়ারের একটা ফান্ড রয়েছে। সেখান থেকে নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে টাকাপয়সা দেওয়া হয়। মেধাবী গরিব ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা চালাতে পারছে না, অর্থের অভাবে কারও ক্যানসার জাতীয় রোগের চিকিৎসা হচ্ছে না—এইসব ক্ষেত্রে এককালীন থোক কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করা হয়। তাছাড়া প্রতিবন্ধীদের নানা প্রতিষ্ঠানে, ব্লাইন্ড স্কুলে, বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওরা মাসিক বা বার্ষিক গ্রান্ট দিয়ে থাকে। নিজের কাজকর্ম ছাড়াও তাদের কোম্পানির এই ফান্ডটা দেখাশোনা করত দীপক।

'আশ্বাস'-এর পক্ষ থেকে অনেক বার গ্রান্টের জন্য দীপকদের কোম্পানিকে আবেদন জানানো হয়েছিল কিন্তু সাড়া পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত মালবিকা সঞ্চারীকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন।

মনে পড়ে, সেদিন ভীষণ ব্যস্ত ছিল দীপক। প্রায় ঘণ্টাখানেক রিসেপশনে বসে থাকার পর তার কামরায় ডাক পড়েছিল সঞ্চারীর।

ক্যামাক স্ট্রিটের একটা বিশাল হাই-রাইজের পাঁচটা ফ্লোর জুড়ে দীপকদের অফিস। পুরো অফিসটাই এয়ার-কন্ডিশনড।

দীপকের কামরাটা কার্পেট, দামি দামি চেয়ার টেবল, কম্পিউটার, তিন-চারটে টেলিফোন, নানা ধরনের ক্যাবিনেট দিয়ে সাজানো।

দীপক তাকে বসতে বলে জানিয়েছিল, 'আই অ্যাম এক্সট্রিমলি বিজি টুডে। আপনাকে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হল। ভেরি সরি।'

এমনিতে সঞ্চারী ধীর, স্থির, শান্ত। সহজে মেজাজ গরম হয় না। কিন্তু পাক্কা একটি ঘণ্টা বসিয়ে রাখার জন্য মস্তিষ্ক তপ্ত হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, টাকার জন্য হাত পাততে এসেছে বলেই এত অবজ্ঞা। ভাবখানা এই—যাবে কোথায়? যতক্ষণ বসিয়ে রাখব, প্রার্থী বসে থাকতে বাধ্য।

সঞ্চারী নীরস সুরে বলেছিল, 'ইউ শুড বি সরি।'

যারা সাহায্যের জন্য আসে, তারা এভাবে কথা বলে না, রীতিমতো হাত কচলাতে থাকে। দীপক থতিয়ে গিয়েছিল।—'আমি—আমি—'

সঞ্চারীর মাথায় সেদিন কী ভর করেছিল, সে-ই জানে! বলেছিল, 'আপনারা ডেস্টিটিউটদের জন্য ফান্ড খুলেছেন। এতে নিশ্চয়ই অনেকের উপকার হচ্ছে। কিন্তু আপনাদের বেনিফিটও কম নয়।'

দীপক হতভম্বের মতো বলেছে, 'মানে?'

'আপনাদের কোম্পানির দাতাকর্ণ হিসেবে কত পাবলিসিটি হচ্ছে, নিজেই ভেবে দেখুন। তা ছাড়া, ইনকাম ট্যাক্সের দিক থেকে কতটা ছাড় পাবেন, আমি না জানলেও কোম্পানির একজন রেসপনসিবল অফিসারের সেটা অবশ্যই জানা উচিত।'

'রেসপনসিবল অফিসার' যে তাকেই বলা হচ্ছে তা না বোঝার কারণ নেই। কাঁচুমাচু মুখে দীপক কৈফিয়ত দিতে চেয়েছে।—'বিশ্বাস করুন, আমার ভীষণ কাজের প্রেসার চলছে। আপনাকে ইচ্ছা করে বসিয়ে রাখিনি। প্লিজ, ডোন্ট মিস-আন্ডারস্ট্যান্ড মি।'

এরপর রাগ বা ক্ষোভ পুষে রাখা যায় না। সঞ্চারীর তপ্ত মেজাজ শান্ত হয়ে গেছে। তার মনে হয়েছে, অতটা রূঢ় না হলেও সে পারত। হাজার হোক, তাদের প্রতিষ্ঠান হল প্রার্থী। যাদের হাত পাততে হয় তাদের অধৈর্য হলে চলে না।

সঞ্চারী বলেছে, 'ঠিক আছে। আমারও ওভাবে বলা ঠিক হয়নি। প্লিজ, কিছু মনে করবেন না।'

গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়েছে। দীপকের মুখে হাসি ফুটেছে। সে বলেছিল, 'ফরগেট ইট। বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

অনুদানের জন্য 'আশ্বাস'-এর একটা আবেদন দীপকদের 'সোশাল ওয়েলফেয়ার ফান্ড'-এর দপ্তরে যে বছরখানেক ধরে পড়ে আছে সেটা মনে করিয়ে দিয়ে সঞ্চারী বলেছিল, 'বুঝতেই পারছেন, নানা জায়গা থেকে গ্রান্ট বা ডোনেশন না পেলে আমাদের মতো অর্গানাইজেশনগুলোর কাজ চালানো অসম্ভব। অন্যদের বাদ দিয়ে নিজেদের কথাই বলি। সোসাইটির কোথাও যাদের জায়গা নেই সেই রেপ ভিকটিমদের নিয়ে আমাদের কাজ। এদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আর্থিক সাহায্য পাওয়া না গেলে অর্গানাইজেশন বন্ধ করে দিতে হবে। তার রেজাল্ট এই—মেয়েগুলো একেবারে শেষ হয়ে যাবে।' এক দমে কথাগুলো বলে একটু থেমেছিল সে। তারপর ফের শুরু করেছে, 'যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের জন্যে যদি গ্রান্টের ব্যবস্থা করে দেন, খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।'

দীপক বলেছিল, 'আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না। নেক্সট উইকের শেষের দিকে একটা ফোন করবেন।'

'ফোন কেন, আমি নিজেই চলে আসব।'

টাকাটা যে কতটা জরুরি সেটা বুঝতে পারছিল দীপক। নইলে সঞ্চারী আসতে চাইত না। তার হয়তো ধারণা, ফোন করার চাইতে নিজে চলে এলে অনেক বেশি কাজ হবে। দীপক বলেছে, 'ঠিক আছে, আসবেন।'

পরের সপ্তাহেই গ্রান্টটা বার করা যায়নি। আরও বারকয়েক ছোটাছুটির পর প্রায় মাস দেড়েক বাদে ওটা মঞ্জুর হয়েছিল। আসলে সবটাই তো দীপকের হাতে নেই। তাদের 'ফান্ড'-এর একটা গভর্নিং বডি আছে। এই বডির মেম্বাররা কোন ধরনের অর্গানাইজেশনে কী কাজের জন্য কত টাকা গ্রান্ট বা ডোনেশন দেওয়া হবে তা ঠিক করেন। দীপক এই বডির একজন গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার। সে 'আশ্বাস'-এর আবেদনপত্র গুছিয়ে গাছিয়ে, তার ওপর নোট দিয়ে এমন নিখুঁতভাবে সাজিয়ে দিয়েছিল যে কোথাও ফাঁক ছিল না।

দীপকদের 'ফান্ড' বছরে কোনও অর্গানাইজেশনকে তাদের কাজের মেরিট খতিয়ে দেখে বছরে সর্বাধিক এক লাখ টাকা পর্যন্ত গ্রান্ট দিয়ে থাকে। দীপকের সুপারিশেই 'আশ্বাস'-এর জন্য ওই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল।

যেদিন গ্রান্ট মঞ্জুর হবার খবরটা পাওয়া গেল, খুশিতে কৃতজ্ঞতায় সঞ্চারী আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। গভীর গলায় বলেছে, 'আপনার জন্যেই এটা সম্ভব হল।'

দীপক বলেছে, 'আমি ব্যাপারটা এগিয়ে দিয়েছি মাত্র। আপনাদের অর্গানাইজেশন যে কাজ করছে সেজন্যে গ্রান্ট এমনিতেই পেয়ে যেত। তবে হয়তো আরও কিছুদিন দেরি হত।'

'একদিন কিন্তু আমাদের 'আশ্বাস'-এ আপনাকে যেতে হবে।'

'যাব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর দীপক সঞ্চারীর দিকে ঝুঁকে বলেছে, 'গ্রান্টের ব্যবস্থা তো হয়ে গেল। আর কি আমাদের দেখা হবে?'

তার চোখের দৃষ্টি এবং গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, যাতে সঞ্চারীর শরীরে

হালকা একটা শিহরণ খেলে গেছে। গ্রান্টের জন্য দৌড়ঝাঁপের মধ্যেই সে টের পাচ্ছিল, তাকে দীপকের ভালো লেগেছে। সঞ্চারী লক্ষ করেছে, কথা বলতে বলতে দীপকের চোখে কেমন একটা মুগ্ধতা ফুটে উঠত। এ নিয়ে তেমন কিছু ভাবেনি সে। অনুদানটা বার করাই তখন তার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু গ্রান্ট মঞ্জুর হবার পর দীপক যখন জানতে চাইল, আর দেখা হবে কিনা, তখনই প্রথম টের পেল, তার বুকের ভেতর কোনও গোপন কুঠুরিতে নিজের অজান্তে দীপকের প্রতি অনেকখানি ভালো লাগা জমা হয়ে গেছে। মুখ নামিয়ে সঞ্চারী নীচু গলায় বলেছে, 'হবে।'

এরপর মাঝে মাঝেই তাদের দেখা হয়েছে। কখনও দীপকের অফিসে। কখনও কোনও রেস্তোরাঁয়। একদিন তাকে 'আশ্বাস'-এর অফিসেও নিয়ে এসেছিল।

কয়েক মাসের ভেতর তারা অনেকটা কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। নিজের কথা দীপককে সবই জানিয়েছে সঞ্চারী। দীপকও তার কথা বলেছে।

দীপকরা তিন ভাই, এক বোন। সে সবার ছোট। এক দাদা আছে লন্ডনে, তার মেমসাহেব বউ, দুই ছেলেমেয়ে। এক দাদা রয়েছে মুম্বাইতে, সে বিয়ে করেছে গুজরাতি মেয়ে। তাদের একটাই ছেলে। দিদি কলকাতাতেই আছে। বালিগঞ্জে তার শ্বশুরবাড়ি। তার ছেলেমেয়ে নেই।

দীপকদের বাড়ি শ্যামবাজারে। ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাড়িতে রয়েছেন তার বাবা, মা, জেঠামশাই, জেঠতুতো এক দাদা, তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা।

বাবা এবং জেঠামশাই রিটায়ার করেছেন। বাবা ক্রিকেট আর ফুটবল নিয়ে মেতে আছেন। কম বয়সে দু'টোই ভালো খেলতেন। সি এ বি এবং একটা বড় ফুটবল ক্লাবের মেম্বার। টেস্ট ম্যাচ, ওয়ান-ডে, রঞ্জি ট্রফি, যাই হোক না, তিনি ইডেনে ছুটবেন। ফুটবলের মরশুমে ময়দানই তাঁর ঘরবাড়ি। তাছাড়া, টিভি'র তিন-চারটে স্পোর্টস চ্যানেলে অনবরত পৃথিবীর নানা দেশের নানা ধরনের খেলা দেখায়। যতক্ষণ বাবা বাড়িতে থাকেন, তাঁর চোখ স্পোর্টস চ্যানেলে আটকে থাকে। জেঠামশাইয়ের ভ্রমণের নেশা। বছরে অন্তত চার বার উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, এমনকি জঙ্গি হামলাকে আমল না দিয়ে কাশ্মীরেও ছোটেন। বার তিন-চারেক সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং ব্যাংকক ঘুরে এসেছেন। একবার সারা ইউরোপ চষে বেড়িয়েছেন। জেঠাইমা জপতপ, পুজো, গুরুদেব—

এসব নিয়ে মেতে থাকেন। বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম চলে মায়ের কথায়, তাঁর নির্দেশে। তিনিই সংসারের ডিক্টেটর, পরিবারের শিরদাঁড়া।

শুনতে শুনতে সঞ্চারীর মনে হয়েছে, দীপকদের ফ্যামিলি বেশ বনেদি, শিক্ষিত এবং পয়সাওলা।

এসবের মধ্যেও কাজের কথা ভোলেনি সঞ্চারী।

একদিন সঞ্চারী দীপককে বলেছিল, 'আপনি আমাদের অর্গানাইজেশনকে অনেক হেল্প করেছেন। আপনার কাছে আমাদের এক্সপেক্টেশন কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে।'

বেশ অবাকই হয়েছে দীপক।—'কিরকম?'

কয়েকটা বড় বড় দেশি এবং মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির নাম করে সঞ্চারী জানিয়েছে, এদেরও ওয়েলফেয়ার ফান্ড আছে। কিন্তু অনেক ছোটাছুটি, অনেক কাকুতি মিনতি করেও তাদের কাছ থেকে একটি পয়সাও অনুদান পাওয়া যায়নি। ওই কোম্পানিগুলোতে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কোনও অফিসারের সঙ্গে দীপকের যদি জানাশোনা থাকে, আর সে যদি 'আশ্বাস'-এর প্রয়োজনটা তাঁদের ভালো করে বুঝিয়ে গ্রান্ট বা ডোনেশনের ব্যবস্থা করে দেয়, সঞ্চারীরা অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পারে।

'অন্য কোম্পানির অফিসারদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকতে পারে, এমন একটা ধারণা আপনার হল কী করে?'

'অনেক সময় থাকে তো। জাস্ট অনুমান। এমনও দেখেছি, একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে, এরকম দুই বন্ধুর একজন একটা ফার্মের টপ পোস্টে রয়েছে, আরেক বন্ধু আছে অন্য একটা বড় কোম্পানির ইমপর্টান্ট পোস্টে।'

দীপক হেসেছিল।—'আপনি রিয়ালি ইনটেলিজেন্ট। দারুণ কাজের মেয়ে। নিজের অর্গানাইজেশনের ইন্টারেস্ট হচ্ছে আপনার টপ প্রায়োরিটি।' একটু থেমে ফের বলেছে, 'ইউ গেইন। যে কোম্পানিগুলোর নাম করলেন তার তিনটেতে আমার তিন বন্ধু টপ একজিকিউটিভ। তাদের আমি বলে দেব। আশা করি, কাজ হবে।'

কাজ হয়েছিল।

বিপুল পরিমাণে ডোনেশন এবং গ্রান্ট আনার জন্য 'আশ্বাস'-এ সঞ্চারীর কদর বাড়ছিল। ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল সে। আরও বেশি দায়িত্ব তো

তাকে দেওয়া হয়েছিলই, সেই সঙ্গে মাইনেও বেড়ে গিয়েছিল অনেকটা। যখন এখানে কাজটা পায়, সঞ্চারী ছিল সাধারণ একজন এমপ্লয়ী। কিছুদিনের মধ্যে অনেক ওপরে উঠে এসে সে হয়ে যায় ডেপুটি প্রোগ্রাম অফিসার। 'আশ্বাস'-এর ডিরেক্টর মালবিকা রুদ্র সব ব্যাপারে তার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন। তার পরামর্শ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তই নিতেন না।

এদিকে দীপকের ওপরও নির্ভরতা বাড়ছিল সঞ্চারীর। সে সঞ্চারীকে তার তিন বন্ধুর কাছেই শুধু পাঠায়নি, আরও কয়েকটা অফিসেও পাঠিয়েছে। তাদেরও সোশাল ওয়েলফেয়ার ফান্ড আছে। এই অফিসগুলোতে দীপকের আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ উঁচু উঁচু পোস্টে রয়েছে। তাই ডোনেশন বা গ্রান্ট পেতে অসুবিধা হয়নি।

এর ফাঁকে ফাঁকে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ছিল দু'জনের। কবে যে তারা পরস্পরকে তুমি বলতে শুরু করেছে, আজ আর মনে পড়ে না।

একদিন এক রেস্তোরাঁয় চা খেতে খেতে দীপক বলেছিল, 'জানো সঞ্চারী, তোমার কথা আমাদের বাড়িতে বলেছি।'

চমকে উঠেছে সঞ্চারী।—'কী বলেছ?' তার কাঁপা কাঁপা হাত থেকে চা চলকে পড়েছিল।

'বলেছি, একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। সে রেপ-ভিকটিম, ডেজার্টেড মেয়েদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে তাদের সেলফ-সাপোর্টিং করে তোলার চেষ্টা করছে।'

সঞ্চারী কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছিল। জিগ্যেস করেছে, 'শুনে ওঁরা কী বললেন? নিশ্চয়ই এমন একটা মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে রাগারাগি করেছেন?'

'নো নো, নট অ্যাট অল—' জোরে জোরে মাথা নেড়েছে দীপক।—'বলেছে মেয়েটা তো দারুণ কাজ করছে। আ গ্রেট সোশাল সারভিস। ভেরি ভেরি কমেন্ডেবল। মেয়েটার সাহস আছে।'

এটা আশা করেনি সঞ্চারী। অবাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে থেকেছে।

সঞ্চারীর মনোভাব আঁচ করে নিয়ে দীপক হেসে বলেছে, 'আমাদের বংশ খুব পুরনো। লোকে বলে বনেদি। কিন্তু কোনও বাজে সংস্কার নেই। বাবা জেঠা মা জেঠী সবাই খুব উদার। ভালো কাজের প্রশংসা করতে তাদের আটকায় না।'

সঞ্চারী উত্তর দেয়নি। শুধু তাকিয়েই থেকেছে।

দীপক বলেছিল, 'বাড়ির সবাই তোমাকে দেখতে চায়।' বলতে বলতে গলা নামিয়ে জিগ্যেস করেছে, 'যাবে একদিন আমার সঙ্গে?'

এমন একটা সংস্কারমুক্ত, অভিজাত পরিবারের মানুষগুলিকে দেখার জন্য সঞ্চারীও ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। বলেছে, 'যাব।'

দীপকের মুখে তাদের ফ্যামিলি সম্বন্ধে যা শুনেছিল, ওদের বাড়ি গিয়ে সঞ্চারী দেখল ওর বাবা-জেঠারা তার চাইতেও অনেক বেশি মুক্ত মনের মানুষ। ওকে দেখে সবাই ভীষণ উচ্ছ্বসিত। সঞ্চারীর মতো মেয়ে আগে তাঁদের চোখে পড়েনি। সে সাহসী, সে সহৃদয়, একটা মহান সামাজিক কর্তব্য পালন করে চলেছে। সোসাইটির জন্য তার মতো মেয়ে অত্যন্ত প্রয়োজন।

বাড়িসুদ্ধ মানুষের এত উচ্ছ্বাসে, এত মহিমাকীর্তনে সঞ্চারী আপ্লুত। তারই মধ্যে একটা ব্যাপার সে লক্ষ করেছে, এই যে বাড়ির একটি ছেলে একটি তরুণীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সেজন্য কারও ভুরু কুঁচকে যায়নি। সঞ্চারীর সঙ্গে দীপকের বন্ধুত্ব হওয়াটা যেন খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এ বাড়িতে কারও গতিবিধি বা পছন্দ-অপছন্দর ওপর লক্ষ্মণের গণ্ডি টেনে দেওয়া হয় না। কে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে বা গভীরভাবে মেলামেশা করবে, সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যাপার। এ নিয়ে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা নেই।

মনে পড়ে, সেদিন খুব যত্ন করে দীপকের মা-জেঠিমারা কাছে বসে প্রচুর খাইয়েছিলেন। চলে আসার সময় বাড়ির সকলে বলেছেন, 'আবার এস।'

আরও কয়েক বার দীপকের সঙ্গে তাদের বাড়ি গেছে সঞ্চারী। প্রথম দিন তার কাজকর্ম সম্বন্ধেই কথাবার্তা হয়েছিল। পরে দীপকের মা-জেঠিমারা তাদের ফ্যামিলি সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়েছিলেন। কী গভীর সংকটের মধ্যে অবিরল যুদ্ধ করে করে সঞ্চারীকে পৃথিবী নামে এই গ্রহে টিকে থাকতে হয়েছে, শুনতে শুনতে অপার সহানুভূতিতে তাঁদের মন ভরে গেছে।

মনে আছে, একদিন মজা করে দীপক বলেছিল, 'কী, তোমাদের বাড়ি আমাকে নিয়ে যাবে না? কবে যাব, বল—'

চকিত হয়ে উঠেছে সঞ্চারী। নিজের মাকে সে খুব ভালোই চেনে। খাদের কিনারায় পৌঁছে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছেন রত্নময়ী। মুখে অবশ্য বলেন, নতুন করে মেয়ে জীবন শুরু করুক। কিন্তু অভিপ্রায় একেবারে অন্যরকম। সঞ্চারী যদি ফের বিয়ে করে তাঁদের কী হবে? তাঁকে এবং রন্টুকে কে দেখবে? দু'দিকের এই টানাপোড়েনে মা কেমন যেন দিশেহারা। জয়দীপের সঙ্গে বিয়ের

আগে যে রত্নময়ীকে সে জানত তিনি হাসিখুশি, সরল, অকপট। তাঁর মধ্যে কোনওরকম ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। শ্বশুরবাড়ি থেকে সঞ্চারীর চলে আসা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, শিবতোষের মৃত্যু, সঞ্চারীর ডিভোর্সের মামলা আর শিবতোষের রোগের চিকিৎসায় যেটুকু সঞ্চয় ছিল সব শেষ হয়ে যাওয়া—এসবের ধাক্কায় রত্নময়ী একেবারে পালটে গেছেন। কেমন যেন রুক্ষ, কর্কশ, সন্দিগ্ধ। সঞ্চারী বুঝতে পেরেছে, ভেতরে ভেতরে সারাক্ষণ ত্রস্ত হয়ে থাকেন মা। হয়তো ভাবেন, মেয়েকে এই বুঝি কেউ কেড়ে নিয়ে গেল।

সঞ্চারীকে চুপ করে থাকতে দেখে দীপক জিগ্যেস করেছে, 'কী হল, কিছু বলছ না যে? তোমাদের বাড়িতে গেলে আপত্তি আছে?'

হকচকিয়ে গেছে সঞ্চারী।—'না না, আপত্তি কিসের?'

'তা হলে কী অত ভাবছিলে?'

সঞ্চারী সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করে দিতে চেয়েছে। হেসে হেসে বলেছে, 'কী আবার ভাবব? কই, কিছু না। পরশু তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।'

মাঝখানে একটা দিন সে হাতে রেখেছিল। কারণ, দীপককে নিয়ে যাবার আগে মায়ের মনোভাবটা সে আঁচ করে নিতে চেয়েছে। রত্নময়ী যদি আপত্তিও করেন, তাঁকে যেভাবে হোক রাজি করাতেই হবে।

পরের দিনের জন্য আর অপেক্ষা করেনি সঞ্চারী। সেদিনই বাড়ি ফিরে রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর সে রত্নময়ীকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বলেছে, 'মা, একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। এক কোম্পানির খুব বড় অফিসার। তুমি তো জানো, আমি যেখানে কাজ করি, নানা জায়গা থেকে টাকাপয়সা জোগাড় করে সেটা চালাতে হয়। এই অফিসারটি সেই ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করছেন। উনি একদিন আমাদের বাড়ি আসতে চান। এত আগ্রহ করে বললেন যে না বলতে পারিনি।'

শুনতে শুনতে চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে রত্নময়ীর। কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকার পর জিগ্যেস করেছেন, 'তোর সঙ্গে আলাপ হল কিভাবে?'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, সাহায্যের জন্যে অফিসে অফিসে আমাকে ঘুরতে হয়, নানা লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়, আর্জি জানাতে হয়। এইভাবেই আলাপ হয়েছে।'

'কারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলে আসতেই তো পারেন। এর ভেতর দোষের কী আছে?'

সঞ্চারী বলেছে, 'এই ধরনের লোকেদের হাতে রাখা দরকার মা। এতে আমাদের 'আশ্বাস'-ও বাঁচবে, আমার চাকরিটাও রক্ষা পাবে।'

সংসারের স্বার্থে সঞ্চারীর চাকরিটা রক্ষা করা যে ভীষণ জরুরি সেটা রত্নময়ীর চাইতে অন্য কেউ ভালো জানে না। তবু পরে যে প্রশ্নটা তিনি করেছেন তাতে মনে হয়েছিল, সংশয়ের একটা কাঁটা তাঁর মাথায় খচখচ করে বিঁধে চলেছে। 'নাম কী ভদ্রলোকের?'

'দীপক বসু।'

'বয়েস কত?'

'চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর রত্নময়ী বলেছেন, 'ঠিক আছে, নিয়ে আসিস।'

কথামতো দীপককে তাদের টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিল সঞ্চারী। তাকে বলেছিল, 'মায়ের সামনে আমাকে তুমি টুমি করে বোলো না কিন্তু—'

দীপকের মজাই লেগেছে। একটা ভুরু উঁচুতে তুলে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কৌতুকের সুরে বলেছে, 'বুঝেছি। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে সেটা মাকে জানতে দিতে চাও না, তাই তো?'

বিব্রত সঞ্চারী কাঁচুমাচু মুখে একটা কৈফিয়ত খাড়া করতে চেয়েছে।— 'মানে, বুঝতেই পারছ মা পুরনো দিনের মানুষ, একটু কনজারভেটিভ। ছেলেমেয়েদের ফ্রি মেলামেশা—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে দীপক বলেছে, 'আর বলতে হবে না। যা বোঝার বুঝে গেছি। তোমাকে আমি কোনওরকম ঝামেলায় ফেলব না।'

দীপককে বাড়ি নিয়ে আসার পর সত্যিই লেশমাত্র সংকট হয়নি। সঞ্চারী তাকে যেমন যেমন শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিল, সুবোধ বালকের মতো তেমনটাই করে গেছে সে। একবারও তার মুখ দিয়ে 'তুমি' বেরোয়নি। শোভনতা বজায় রেখে কথা বলে গেছে। তার সঙ্গে সঞ্চারীর যে ঘনিষ্ঠতা আছে, ঘুণাক্ষরেও তা বুঝতে দেয়নি।

রত্নময়ীও দীপককে যথেষ্ট খাতির-যত্ন করেছেন। যার ওপর মেয়ের অফিস এবং তার চাকরির নিরাপত্তা অনেকটাই নির্ভর করছে তাকে খুশি রাখা একান্ত জরুরি। কিন্তু তারই মধ্যে কথায় কথায় খুব সূক্ষ্মভাবে দীপক সম্পর্কে নানা তথ্য

জোগাড় করে নিয়েছেন। তার বাড়ি কোথায়, মা-বাবা ভাই-বোন কে কী করে, তার বিয়ে টিয়ে হয়েছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রত্নময়ীর প্রশ্নগুলো আপাতদৃষ্টিতে খুবই নিরীহ। নতুন কেউ এলে এসব তো জিগ্যেস করাই যায়। কিন্তু সঞ্চারী টের পাচ্ছিল, মায়ের এইসব অকপট কৌতূহলের পেছনে রয়েছে তাঁর মনের বদ্ধমূল সংশয়।

সঞ্চারীর ধারণা যে নির্ভুল, সেটা টের পেতে দেরি হয়নি। দীপক চলে যাবার পর রত্নময়ী হেসে হেসে বলেছেন, 'ছেলেটা খুব ভালো রে—'

রত্নময়ীর জটিল ভাবনা-চিন্তার গতিমুখ কোন দিকে তা আন্দাজ করতে চেষ্টা করেছিল সঞ্চারী। সতর্কভাবে বলেছে, 'শিক্ষিত ভদ্রলোক, বনেদি বংশের ছেলে, ভালো হওয়াই তো উচিত। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'বাজে, খারাপ ছেলে হলে তার সঙ্গে আমি মিশতাম, না তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতাম?'

তক্ষুনি সায় দিয়েছেন রত্নময়ী। 'তা তো ঠিকই। তুই আমার মেয়ে। তোর রুচি, তোর পছন্দ কেমন, আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তা হ্যাঁ রে—' বলে হঠাৎ চুপ করে গেছেন।

রত্নময়ীর বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু রয়েছে যাতে কিসের একটা সংকেত যেন পেয়ে গেছে সঞ্চারী। মায়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছে সে। কোনও প্রশ্ন করেনি।

রত্নময়ী জিগ্যেস করেছেন, 'দীপক তো আমাদের বাড়ি এল। তোকে কখনও ওদের বাড়ি নিয়ে যায়নি?'

সঞ্চারী হতচকিত। ওই যে কারা যেন খড়ি পেতে ভূ-ভারতের সব খবর বলে দিতে পারে, মা কি সেরকম কিছু গূঢ় বিদ্যা শিখে নিয়েছেন? না জানালেও অনেক কিছুই ঠিক ঠিক আন্দাজ করে নিতে পারেন?

প্রথমটা থতমত খেয়ে গেছে সঞ্চারী। তারপর জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ডাহা মিথ্যেই বলেছে, 'না না, আমি কেন যাব ওঁদের বাড়ি? আমাকে কি যেতে বলেছেন?'

'যেভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছিস তাতে তো মেনে নিতেই হয় যাসনি।'

মাথা নাড়াটা বুঝিবা বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে গেছে। মায়ের চোখে পুরোপুরি ধুলো দেওয়া বোধহয় সম্ভব হয়নি। সঞ্চারী ভেতরে ভেতরে সিঁটিয়ে গিয়েছিল।

রত্নময়ী কিন্তু খেপে ওঠেন নি। খুব মিষ্টি করে বলেছেন, 'ওদের বাড়ি না গেলেও বাইরে নিশ্চয়ই দীপকের সঙ্গে দেখা হয়। কী—হয় না?'

মিছে কথায় সড়গড় নয় সঞ্চারী। বলতে গেলে জিভে আটকে যায়। মায়ের নজরকে যখন ফাঁকি দেওয়া যাবে না, কিছুটা সত্যি বলাই শ্রেয়। সে বলেছিল, 'মাঝে মাঝে হয়। 'আশ্বাস'-এর নানা দরকারে ওঁদের অফিসে আমাকে যেতে হয়। অনেক টাকা ওরা আমাদের গ্রান্ট দেয়। আমার চাকরি, অতগুলো মেয়ের খরচ চালানো—না গেলে চলে?'

গলা নামিয়ে প্রায় ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিসফিস কবেছিলেন রত্নময়ী।—'একশো বার যাওয়া দবকার। তা কী বলে দীপক?'

ভুরু কুঁচকে গেছে সঞ্চারীর।—'কী বলবে?'

'এই বিয়ে-টিয়ের কথা—'

সারা শরীরে চমক খেলে গিয়েছিল সঞ্চারীর। যতই দীপক আর সে কাছাকাছি চলে আসুক, বিয়ের কথা সে কখনও মুখ ফুটে বলেনি। সঞ্চারী মানসিক দিক দিয়ে সেভাবে প্রস্তুতও নয়। জয়দীপ যেভাবে তার স্বপ্নের একটা পৃথিবীকে ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে তারপর সব পুরুষের ওপরেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। মনে হত, এদের সবার মধ্যেই লুকনো রয়েছে ধড়িবাজ, প্রতারক, একেকটি লম্পট। কিন্তু দীপক সম্পর্কে তখন অব্দি তার অভিযোগ ছিল না। যতটা সে মিশেছে, যতখানি দেখেছে, তাতে মনে হয়েছে এই যুবকটি সহৃদয়। সঞ্চারী তাকে বিশ্বাস করতে, তার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছিল। কিন্তু বিয়ের চিন্তা মাথাতেই আসেনি। দীপকের মনের নীহারিকায় এমন কোনও ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিনা তার জানা ছিল না।

সঞ্চারী বলেছে, 'না, এ নিয়ে দীপক কিছুই বলেনি।'

রত্নময়ী আগের মতোই চাপা গলায় জিগ্যেস করেছেন, 'আমার কাছে লুকোচ্ছিস না তো?'

মা যেভাবে ঝানু ল'ইয়ারদের মতো জেরা করে যাচ্ছিলেন তাতে মনে হয়েছিল, স্বীকারোক্তি আদায় না করে ছাড়বেন না। সঞ্চারী উত্যক্ত হয়ে উঠেছে। ঝাঁঝালো স্বরে বলেছে, 'তুমি কী ভাবো বল তো মা! আমার মতো একটা ডিভোর্সি মেয়েকে ও বিয়ে করতে যাবে! এটা কখনও হয়?' মাকে প্রায় ধমকে থামিয়ে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মনের কোণে অনেকখানি দুরাশা কি তার ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কোনও কোনও বিজন মুহূর্তে, নিজেকে যখন পৃথিবীর সমস্ত

কিছু থেকে আলাদা করে পাওয়া যেত, সঞ্চারীর মনে হত যে কাম্য পুরুষটির সঙ্গে এত মেলামেশা, এমন বন্ধুত্ব, একদিন না একদিন সে মুখ ফুটে বিয়ের কথা বলবে। তবু একটা কথা কখনও ভুলতে পারত না সঞ্চারী। দীপকরা বিশাল বড়লোক, তাদের বিরাট অভিজাত বংশ। সবাই উচ্চশিক্ষিত। এমনিতে ওদের বাড়িতে উদারতার একটা আবহাওয়া রয়েছে। দীপকের মা বাবা জেঠা জেঠি এবং পরিবারের অন্য সকলকে বেশ অকপট, সাদাসাপটা, হাসিখুশি মনে হয়েছে। কিন্তু একটি ডিভোর্সি মেয়েকে বাড়ির বউ করার কথা বললে মানুষগুলো কতটা বদলে যাবে, তাদের ভালোমানুষির আবরণ ভেদ করে কোন চেহারা বেরিয়ে পড়বে, কে জানে।

সঞ্চারী নিজের সম্পর্কে ভীষণ সচেতন। তারা যে অতি তুচ্ছ মধ্যবিত্ত, সোসাইটির নীচের দিকে তলানির মতো পড়ে আছে তা লহমার জন্যও ভোলে না। জয়দীপের সঙ্গে সম্পর্কটা কবেই কাটান ছাড়ান হয়ে গেছে। দীপকের সঙ্গে নতুন করে জীবন শুরু করার তীব্র, সঙ্গোপন একটা ইচ্ছা তার মধ্যে ডালপালা মেলতে শুরু করেছিল। পাছে স্বপ্নভঙ্গ ঘটে, পাছে এ নিয়ে আগ্রহ দেখালে সরাসরি দীপক না বলে দেয়, তাই নীরবেই থাকে। তা ছাড়া সে একটা মেয়ে, তার প্রখর আত্মসম্মান বোধ। মনে যা আছে, মুখ ফুটে কখনও তা বলবে না। যা সে পারে তা হল আশায় আশায় থাকা।

সেদিনের পর বিয়ের ব্যাপারে সরাসরি কোনও ইঙ্গিত না দিলেও চিন্তাটা রত্নময়ীর মাথায় থেকেই গিয়েছিল। মাঝে মাঝেই এই নিয়ে তিনি সঞ্চারীকে খোঁচা দিয়েই চলেছেন।

ওদিকে নিজের জীবনের খুঁটিনাটি সব দীপককে অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিল সঞ্চারী। কিছুই গোপন করেনি।

দীপক খুবই হৃদয়বান। সঞ্চারী যে 'আশ্বাস'-এর ডেপুটি প্রোগ্রাম অফিসার হতে পেরেছে সেটা ওরই জন্য। কত ভাবে যে সে তাকে সাহায্য করেছে!

দীপক এমনিতে খুবই উদার, আমুদে, হইচই করতে ভালোবাসে। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সঞ্চারীর যোগাযোগ আছে, প্রায়ই সে সেখানে যায়, এটা পছন্দ করে না। অমরনাথদের প্রসঙ্গ উঠলে প্রথম প্রথম চুপ করে থাকত সে। তারপর আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়েছে, যাঁদের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই তাঁদের কাছে যাওয়া ঠিক নয়। রত্নময়ীর অভিমতও অবিকল তা-ই।

মায়ের মতো দীপককেও সঞ্চারী বুঝিয়েছে, কেন অসহায় দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে না গিয়ে সে পারে না। শুনতে শুনতে দীপকের মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। তবে সে কোনও উত্তর দিত না। নীরব থেকেই সে তার অপছন্দ বা অনিচ্ছা বুঝিয়ে দিত। মানুষের মনের ভেতরটা জটিল এক গোলকধাঁধা। কিন্তু সমস্ত কিছু খুলে বলা সত্ত্বেও কেন যে সেখানে সংশয় জমা হয়ে থাকে, কে বলবে।

নিজেকে সঞ্চারীর একেক সময় মনে হয় জাদুকরী, কিংবা অলৌকিক কোনও ক্ষমতার অধিকারিণী। তার একদিকে রত্নময়ী, একদিকে দীপক, আরেক দিকে অমরনাথ এবং প্রতিমা। এই তিন প্রান্তের টানাপোড়েন কিভাবে যে সামাল দিয়ে চলেছে, একমাত্র সে-ই জানে।

এইভাবেই জাগতিক নিয়মে সময় কেটে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে হঠাৎই একদিন দীপকের কোম্পানি তাকে ওদের দিল্লি অফিসে পাঠিয়ে দিল। দীপক ট্রান্সফারটা আটকানোর অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঠেকানো যায়নি।

দীপক চলে যাওয়ায় গোড়ার দিকে ভেঙে পড়েছিল সঞ্চারী। মনে হয়েছিল জীপনের একটা বড় অংশ ফাঁকা হয়ে গেছে। দীপক তার বড় বল-ভরসা, সে কাছে থাকলে পায়ের তলায় শক্ত মাটির স্পর্শ পায়।

দীপক দূরে চলে গেছে। তাকে কি আর আগের মতো নিবিড় করে পাওয়া যাবে? দিল্লিতে নানা ব্যস্ততা এবং নতুন নতুন বন্ধু, তাদের দু'-চারজন রূপসী বান্ধবী যে থাকবে না তা তো নয়, এসবের মধ্যে আরও দূরে সরে যাবে দীপক। তার কাছে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাবে সঞ্চারী।

কিন্তু না, তার ধারণা বা সংশয় যে ঠিক নয় সেটা বুঝতে দেরি হয়নি। দিল্লিতে পৌঁছেই ফোন করেছিল দীপক। তারপর নিয়মিত দু'-একদিন পর পরই করে আসছে। শুধু তাই না, ওখানকার বড় বড় ফার্মগুলোতে যে সোশাল ওয়েলফেয়ার ফান্ড রয়েছে সেসব জায়গায় যোগাযোগ করে সঞ্চারীদের 'আশ্বাস'-এর জন্য যদি গ্রান্ট-ট্রান্ট পাওয়া যায় তার চেষ্টা করে চলেছে। এখনও অব্দি কোনও রকম সাহায্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু দীপক নাছোড়বান্দা। সে লেগে আছে। তার বিশ্বাস, দু'মাস, ছ'মাস বা এক বছর, যতদিনই লাগুক সঞ্চারীদের অর্গানাইজেশনকে গ্রান্ট বা ডোনেশন পাইয়ে দেবেই। সঞ্চারীর মনে সংশয়ের যে কুয়াশা জমেছিল তা ধীরে ধীরে কেটে গেছে। কিছুই খোয়া যায়নি। দীপক তার পাশেই আছে।

কয়েকদিন আগে দীপক একটা সুখবর দিয়েছিল। সে কলকাতায় ফিরে

আসার চেষ্টা করছে। তার পিসেমশাইয়ের এক ভাই ওদের দিল্লি অফিসে জি. এম হিসেবে জয়েন করেছেন মাসখানেক আগে। দীপক তাঁকে খুব ধরেছে, ওকে যেন কলকাতার হেড অফিসে ট্রান্সফার করা হয়। কিন্তু মুখ থেকে কথা খসলেই তো সব কিছু পাওয়া যায় না। তবে সম্ভাবনা আছে। দীপকের আশা, এই বছরের শেষাশেষি সে ফিরে আসতে পারে।...

কতক্ষণ সঞ্চারী ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল এবং অদৃশ্য কোনও পর্দায় তার উনত্রিশ বছরের জীবনটা চমকপ্রদ ফিল্মের মতো ফুটে উঠছিল, খেয়াল নেই। আচমকা কর্কশ চিৎকারে চমকে উঠল।

আবাসনের এপাশের উঁচু উঁচু গাছগুলোর গোপন কোটরে অগুনতি পেঁচার আস্তানা। দিনের বেলা তারা ঝিম মেরে থাকে। তখন তাদের দেখা যায় না ; কোনও রকম সাড়াশব্দও কানে আসে না। কিন্তু নিশুতি রাতে তাদের ঘুম ভাঙে। গর্ত থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চারদিকে জানান দেয় তারা আছে।

এই মুহূর্তে এ-গাছ ও-গাছ থেকে কোরাসে পেঁচাদের ডাক মধ্যরাতের নৈঃশব্দ্যকে করাতের মতো চিরে চিরে দিচ্ছে। সমস্ত আবাসনটা কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হয়।

সঞ্চারী আর দাঁড়িয়ে থাকল না। বেডরুমে ফিরে এসে লাগোয়া চানঘর থেকে চোখেমুখে জল ছিটিয়ে, ভালো করে মুছে, শুয়ে পড়ল।

॥ চার ॥

অন্য দিনের মতো আজও চান সেরে, রুটি-তরকারি খেয়ে, আটটা বাজতে না-বাজতেই বেরিয়ে পড়ল সঞ্চারী। রত্নময়ী হট কেসে দুপুরের খাবার গুছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যেমনটা রোজ দেন। সঞ্চারী নেয় নি। জানিয়েছে, অফিসে যাবার পথে তাদের 'আশ্বাস'-এর কাজে দু'-তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। খাবারের কেস হাতে ঝুলিয়ে তাদের কাছে যাওয়াটা ভালো দেখায় না। দুপুরে অফিসের কাছাকাছি কোনও হোটেল থেকে ভাত, মাছের ঝোল-টোল আনিয়ে নেবে।

আসলে সঞ্চারী প্রথমে যাবে ভবানীপুরে। অমরনাথরা কী ধরনের উটকো সমস্যায় পড়েছেন সেটা শুনে সেখান থেকে সোজা অফিসে। কিন্তু মাকে এসব

বললে এই সকালবেলাতেই একচোট অশান্তি হবে। দিনটা তিক্তভাবে শুরু হোক তা সে একেবারেই চায় না।

রত্নময়ীর চোখে ধুলো দেওয়া কিন্তু অত সহজ নয়। দুপুরের খাবার না নেবার অজুহাতটা তিনি মোটামুটি ধরে ফেলেছেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকেন। তবে কোনও প্রশ্ন করেন না।

ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি সেকেলে ধাঁচের মজবুত তেতলা বাড়ি অমরনাথদের। গেটে পুরনো দারোয়ান রামধারী সিং ছাড়াও রয়েছে চারজন কাজের লোক। রতন, হাবুর মা, ওড়িয়া রাঁধুনি বামুন গুণ্ডিকা মিশ্র, আর কার্তিক। একজন ড্রাইভারও আছে—নাথুলাল পাঁড়ে। আগে আগে অমরনাথ এবং প্রতিমা যখন সুস্থ ছিলেন, বাড়ির বাইরে বেরুতেন। এখন একরকম ঘরবন্দি। তাই নাথুলালের কোনও কাজ নেই। কিন্তু ডিউটিতে ফাঁকি দেওয়াটা তার ধাতে নেই। তার বয়স এখন তেষট্টি। চল্লিশ বছর এ বাড়িতে বাঁধা মাইনেতে চাকরি করছে। কাঁটায় কাঁটায় আটটায় চলে আসে। সারাদিন বসে বসে ঝিমোয়। খাওয়া-দাওয়া সব এখানেই। রাত্তিরে সাড়ে আটটা বাজলে নিজের বাড়িতে ফিরে যায়।

টালিগঞ্জ থেকে ট্যাক্সি নিয়েছিল সঞ্চারী। গেটের কাছে নামতেই দারোয়ান রামধারী সিং দৌড়ে আসে। 'বহুদিদি, আপনি এসে গেছেন! আমরা বঁচ গিয়া।' অনেক কাল কলকাতায় আছে সে। বাংলাটা বুঝতে পারে ভালো, বলতে গেলে কিছু কিছু হিন্দি তার মধ্যে মিশে যায়। রামধারী জানায়, 'পাঁচ রোজ আপনি এ বাড়িতে আসেননি। আমরা কী বিপদে যে কাটিয়েছি! বহুৎ ঝামেলা হচ্ছে।'

সঞ্চারীর চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়।—'কী হয়েছে রামধারীজি?'

চকিতে মুখ ফিরিয়ে একবার বাড়ির ভেতর দিকটা দেখে নেয় রামধারী। তারপর গলা নামিয়ে দেয়।—'বহুদিদি, ওহী হারামজাদটা আবার এসে গেছে। এবার একেলা না, উসকো আওরত ভি।'

রামধারী কাদের কথা বলল, বুঝতে অসুবিধা হয় না সঞ্চারীর। তারাপদ আর মলিনা। তারাপদ অমরনাথের দূর সম্পর্কের ভাই। মলিনা তার স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ধুরন্ধর, ফন্দিবাজ। বিষয়-সম্পত্তি টাকাপয়সা কিছু হাতানো যায় কিনা, সেই মতলবে তারাপদ আগেও দু'-চারবার এখানে হানা দিয়েছে।

সঞ্চারীর ডিভোর্স হয়ে গেছে। জয়দীপ একটি গুজরাতি মেয়েকে নিয়ে

বাঙ্গালোরে থাকে। অমরনাথ আর প্রতিমা প্রায় শয্যাশায়ী। মাঠ একেবারে ফাঁকা। এমন মওকা আর কোথায় পাওয়া যাবে?

তারাপদ আগে একাই এসেছে। কিন্তু তখনও অমরনাথ বা প্রতিমা এখনকার মতো এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েননি। তারাপদর অভিসন্ধিটা আঁচ করে কৌশলে তাকে খালি হাতে ফিরে যেতে তাঁরা বাধ্য করেছেন। কিন্তু লোকটা এবার খুব সম্ভব আটঘাট বেঁধে স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হয়েছে। কাজ হাসিল না করে এখান থেকে নড়বে না।

সঞ্চারী আর দাঁড়াল না। গেটের পরেই ডান পাশে অনেকটা খোলা জায়গা। একসময় সেখানে চমৎকার একখানা বাগান ছিল। অযত্নে এবং তদারকের অভাবে সব হেজে মজে গেছে। বাগানটার ওধারে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় গ্যারাজ। সেখানে একটা অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে আছে। ওটা যে কতকাল বাড়ির বাইরে বেরোয়নি! অমরনাথরা অসুস্থ হয়ে পড়ায় চলাফেরা একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁরা এখন প্রায় ঘরবন্দি।

অমরনাথ আর প্রতিমার বেডরুম তেতলায়। মূল বাড়িটায় ঢুকে ত্বরিত পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল সঞ্চারী। রাঁধুনি গুণ্ডিকা মিশ্র আর হাবুর মায়ের সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলল, সেসব শুনতেই পেল না সে। আসলে অমরনাথদের সঙ্গে দেখা করে ওঁদের সমস্যার কথা শোনার জন্য অত্যন্ত উতলা হয়ে আছে সঞ্চারী। ওপরে উঠতে উঠতে গুণ্ডিকাদের মুখটুখ দেখে এটুকু আন্দাজ করা গেল, সে আসায় ওরা খুবই খুশি এবং উত্তেজিত।

পুরনো বাড়ি, তাই ফ্লোরগুলো খুব উঁচু উঁচু। প্রায় ষাটটা সিঁড়ি টপকে তেতলায় এসে হাঁপিয়ে পড়েছিল সঞ্চারী। অমরনাথদের ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বারকয়েক জোরে জোরে শ্বাস টানল সে। তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেকেলে ভারী ভারী আসবাবে ঘরটা বোঝাই। মাঝখানে পাশাপাশি মেহগনি কাঠের দু'টো বড় খাট। একটা খাটে অমরনাথ বসে আছেন। রুগ্ণ, ফ্যাকাসে চেহারা। প্রতিমা শুয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখেও বোঝা যায়, নানা রোগ তাঁর শরীরে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছে।

প্রতিমা ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সঞ্চারী লক্ষ করল, তাকে দেখে দু'জনের শীর্ণ মুখ আলো হয়ে উঠেছে। অমরনাথ ব্যগ্রভাবে বললেন, 'তোমার জন্যে পাঁচটা দিন অপেক্ষা করে আছি। কী উদ্বেগের মধ্যে যে ছিলাম! মনে হচ্ছিল, তুমি বোধহয় আর আসবে না। আমাদের বোধহয় ত্যাগই করলে।'

প্রতিমা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'পাঁচটা দিন আমরা নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। কী যে করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

সঞ্চারী প্রতিমার খাটের একধারে বসতে বসতে বলল, 'আপনাদের তো ফোনে জানিয়েই দিয়েছি, অফিসের একটা সমস্যায় ভীষণভাবে জড়িয়ে গেছি। সকালে যেতাম, অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে সাড়ে-আটটা ন'টা বেজে যেত। এখানে যে আসব, সময়ই পাচ্ছিলাম না।' 'আশ্বাস'-এ কোন ধরনের মেয়েদের নিয়ে তাকে কী ধরনের কাজ করতে হয়, প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়িকে তা জানায়নি সে। অমরনাথ এবং প্রতিমা সেকেলে ধ্যানধারণার মানুষ। ধর্ষিতা মেয়েদের কথা বললে তাঁরা বড় রকমের ধাক্কা খাবেন। ডিভোর্স হয়ে গেলেও সঞ্চারীকে তাঁরা এ বাড়িরই একজন ভাবেন।

সঞ্চারী ফের বলল, 'কতবার যে আপনাদের এখানে আসার চেষ্টা করেছি তার ঠিক নেই। যখনই বেরুতে যাই, একটা না একটা ঝঞ্ঝাট এসে হাজির হয়।'

অমরনাথ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, সঞ্চারী বলে ওঠে, 'তারাপদবাবু আর তার স্ত্রীকে তো দেখছি না।'

অমরনাথ কয়েক পলক হতবাক তাকিয়ে থাকেন। তারপর জিগ্যেস করেন, 'টেলিফোনে ওদের কথা তো তোমাকে জানাইনি। খবরটা পেলে কী করে?'

'বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রামধারী আমাকে বলেছে।'

'যাক, তা হলে জেনে গেছ।'

আস্তে মাথা নেড়ে সঞ্চারী বলে, 'হ্যাঁ, কী চাইছে ওরা?'

'কী আবার? টাকা। প্রপার্টির কিছুটা অংশ। অসুস্থ বুড়ো-বুড়িরা যে কত অসহায়, সেটা প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছি। অর্থবলই সব নয়, শেষ বয়েসে রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে জনবলটাও বড্ড দরকার। সে যাক, শেয়াল-শকুনের মতো আমাদের ছিঁড়ে খেতে চাইছে তারাপদরা। তুমি ছাড়া সাহায্য করার কেউ নেই। আমাদের বাঁচাও মা—'

একটু ভেবে সঞ্চারী জিগ্যেস করে, 'তারা এখন কোথায়?'

'কাছাকাছি কোথাও বেরিয়েছে। বলে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবে।'

সঞ্চারী বলল, 'বুকের ওপর ওরা এসে চেপে বসে আছে, আর আপনারা টুঁ শব্দটি করেননি! ঘাড় ধরে এই বদমাশদের বার করে দিতে পারলেন না?'

নীরবে দু'জনের কথা শুনছিলেন প্রতিমা। এবার বললেন, 'আমাদের কি

সেই ক্ষমতা আছে? এই জন্যেই তো পাঁচ দিন ধরে বার বার তোমাকে আসার জন্যে ফোন করছি।'

'আমি যখন আসতে পারছিলাম না, পুলিশকে ফোন করে তো জানাতে পারতেন। তারা এসে ওদের তাড়িয়ে দিত।'

অমরনাথের মুখে মলিন একটু হাসি ফোটে।—'থানায় ফোন করতে সাহস হয়নি। পুলিশ সম্বন্ধে কাগজে রোজই কিছু-না-কিছু বেরোয়। সব কোরাপ্ট হয়ে গেছে। টাকা খাইয়ে তারাপদরা তাদের হাত করে রেখেছে কিনা, কে জানে। ফোন করে হয়তো মহা ফ্যাসাদ ডেকে আনব। একদিকে তারাপদরা, অন্য দিকে পুলিশ। জাঁতিকলে পড়ে প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে। হ্যারাস করে করে ওরা আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলবে। এ বয়েসে সে হয়রানি সহ্য করার শক্তি আমাদের নেই।'

সঞ্চারী বলল, 'পুলিশের সবাই ডিসঅনেস্ট, ঘুষখোর, তাই কখনও হয়? অনেক সৎ অফিসার থেকে অর্ডিনারি কনস্টেবলও এই ডিপার্টমেন্টে রয়েছে। বিপদে-আপদে তারা মানুষের পাশে দাঁড়ায়, সাহায্য করে। ওদের সম্বন্ধেও কিন্তু ভালো ভালো রিপোর্ট কাগজে বেরোয়।'

অমরনাথ বললেন, 'সেই অনেস্ট পুলিশ কারা, বুঝব কী করে? আমরা যাদের ডাকলাম তারা হয়তো এককেটা হাঙর কি কুমির।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই তারাপদ আর মলিনা ফিরে এল। শুকনো বৃষকাঠের মতো চেহারা তারাপদর। গায়ে মাংসের চেয়ে হাড় বেশি। লম্বাটে মুখ, ভাঙা গাল। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। পাঁশুটে রঙের পাতলা চুলের মাঝ-বরাবর সিঁথি। গর্তে ঢোকানো গোলাকার চোখে ধূর্ত চাউনি। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি আর হাঁটু অব্দি ঝুলের ফুলশার্ট। দেখামাত্র টের পাওয়া যায় ধড়িবাজ লোক।

মলিনার চেহারাটা গোলগাল, আহ্লাদী পুতুলের মতো। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের মতো বয়স। বেশ ফর্সা রং। ভরাট মুখে অপার সারল্য মাখানো। দেখে মনে হয় না, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে। পরনে জমকালো টাঙ্গাইল শাড়ি, নাকে হীরের নাকছাবি, গলায় চওড়া তেঁতুলপাতা হার, হাতে গোছা গোছা চুড়ি। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই তার ভেতর বিষকুম্ভ লুকনো রয়েছে কিনা।

সঞ্চারীকে দেখে চোখের তারা দু'টো কয়েক লহমা স্থির হয়ে রইল তারাপদর। ওরা খুব ভালো করেই চেনে তাকে।

সঞ্চারীকে এখানে দেখতে পাবে, ভাবতেই পারেনি তারাপদ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কপালে ভাঁজ পড়তে লাগল তার।—'তুমি এ বাড়িতে?'

মাথা গরম করল না সঞ্চারী। হেসে হেসে বলল, 'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। হঠাৎ আপনারা কেন এলেন, সেটা মাথায় ঢুকছে না।'

'এটা আমার দাদার বাড়ি, আসতেই পারি।'

'আমি যতদিন এ বাড়িতে ছিলাম, আপনাদের কিন্তু একবারও আসতে দেখিনি। হঠাৎ এসে এঁদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসাটার পেছনে গোলমেলে ব্যাপার রয়েছে না?'

চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে তারাপদর। অসহ্য ক্রোধে ফেটেই পড়ত সে, অনেক কষ্টে রাগটা রুখে দিল। সঞ্চারীর প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে পালটা প্রশ্ন করল, 'তোমার সঙ্গে জয়ের তো ডিভোর্স হয়ে গেছে। তবু এখানে আসা কেন? উদ্দেশ্যটা কী?'

'আমার উদ্দেশ্য আপনার ঠিক উলটো। ওঁরা চান আমি এখানে আসি। ওঁদের খোঁজখবর নিই। দেখাশোনা করি। জয়দীপের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে, কিন্তু তার মা-বাবার সঙ্গে নয়।' বলে একটু থামে সঞ্চারী। তারপর ফের শুরু করে, 'আরও একটা কারণে আমাকে এখানে আসতে হয়।'

'কী কারণ?'

সঞ্চারী বলল, 'অনেক হিংস্র জন্তু ওয়েল-উইশারের ছদ্মবেশে এখানে রেগুলারলি হানা দিচ্ছে। এরা সবাই জয়দীপদের আত্মীয়-স্বজন। এদের একমাত্র লক্ষ্য—' বলতে বলতে চুপ করে যায় সে। সোজাসুজি তারাপদর চোখের দিকে চোখ রাখে।

কর্কশ স্বরে তারাপদ বলে, 'কী লক্ষ্য?'

'মানি অ্যান্ড প্রপার্টি, যেজন্যে এতদিন বাদে আপনার আগমন হয়েছে।'

এত স্পষ্টভাবে মুখের ওপর সঞ্চারী যে বলতে পারে তা ভাবতে পারেনি তারাপদ। প্রথমটা থতিয়ে গেল সে। অমরনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনছেন দাদা, শুনছেন! এই উটকো মহিলাটি কী বলছে—'

সঞ্চারী এ বাড়িতে আসায় অমরনাথ এবং প্রতিমা হারানো মনোবল অনেকটাই ফিরে পেয়েছিলেন। অমরনাথ বললেন, 'উটকো হতে যাবে কেন? ওকে আমরা নিজেদের ফ্যামিলিরই একজন মনে করি। পৃথিবীর সবাই জানে, আমার ছেলে লম্পট, দুশ্চরিত্র। সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু ওকেই আমরা আঁকড়ে ধরে আছি। ও না থাকলে আমরা কবেই শেষ হয়ে যেতাম।'

এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি মলিনা। তার চোখমুখ থেকে নিষ্পাপ

সারল্যের আবরণটা লহমায় খসে গেল। মেয়েমানুষটির ভেতর একটা বিষধর সাপিনী লুকিয়ে ছিল। সেটা বেরিয়ে এসে ফণা তুলল।—'জয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হবার পরও এই মেয়েটা আপনাদের ফ্যামিলির মেম্বার! এমন আশ্চর্য সম্পর্কের কথা আমরা শুনিনি। কেউ কখনও শুনেছে বলেও মনে হয় না।'

অমরনাথ বললেন, 'ডিভোর্সটা হয়েছে জয়ের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক আগের মতোই আছে।'

তাঁর কথা যেন শুনতেই পেল না মলিনা। হিংস্র ভঙ্গিতে সঞ্চারীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীব্র, কটু গলায় বিষ উগরে দিতে লাগল, 'খুব তো গলা বাজিয়ে বললে আমরা টাকা আর প্রপার্টির লোভে এখানে হানা দিয়েছি। একটা কথার জবাব দাও তো চাঁদবদনী, তুমি কোন মতলবে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও আগেকার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছ?' ভুরু নাচাতে নাচাতে বলে যায়, 'বল বল, মনের কথাটা বলে ফেল—সত্যিই তোমার নজর এ বাড়ির টাকা আর সম্পত্তির দিকে নেই? আমার ভাসুর ঠাকুরদের জন্যে যা করছ, সব নিঃস্বার্থভাবে, তাই না? তোমার মতো মহীয়সী নারীর কথা আগে কখনও শুনিনি বাপু।'

অমরনাথ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। গলার স্বর চড়িয়ে চিৎকার করতে থাকেন, 'খবরদার, বউমাকে অপমান করে একটি কথাও বলবে না।'

তাঁর চেঁচামেচি গ্রাহ্যই করে না মলিনা। সঞ্চারীর দিকে আঙুল তুলে নাচাতে নাচাতে বলে, 'কী হল, চুপ করে রইলে যে? অভিসন্ধিটা ধরে ফেলেছি তো?' বিদ্রূপে তার ঠোঁট দু'টো বেঁকে যায়।

সারা শরীরের রক্ত মাথায় উঠে এসেছিল সঞ্চারীর। একটা বড় রকমের বিস্ফোরণ ঘটে যেত। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে নিল।—'আপনাদের এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে, যা যা সঙ্গে করে এনেছিলেন, সব গুছিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যান।'

এবার তারাপদ গর্জে ওঠে, 'পাজি, বজ্জাত মেয়েছেলে, তোমার হুকুমে আমরা যাব?'

হুলস্থূল বাধিয়ে বিশ্রী, নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করা সঞ্চারীর স্বভাবে নেই। শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে সে বলে, 'আমি বাংলা ভাষাতেই বলছি। বুঝতে কি আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে?'

মলিনা ওপাশ থেকে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'আমরা যাব না, দেখি তুই কী করতে পারিস?'

সঞ্চারী জবাব দেয় না। তার কাঁধ থেকে লেডিস ব্যাগ ঝুলছিল। সেটা খুলে মোবাইল বার করে লোকাল থানার ওসি দীপঙ্কর পালিতকে ধরে ফেলল। জয়দীপের সঙ্গে যখন তুমুল অশান্তি চলছে, এই অফিসারটির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। বেশ কয়েকবার তখন সঞ্চারীকে থানায় ছুটতে হয়েছে।

আজকাল সাধারণ মানুষ পারতপক্ষে পুলিশের ধারে-কাছে ঘেঁষতে চায় না। এই ডিপার্টমেন্টের লোকজন ঘুষখোর, তাদের ব্যবহার জঘন্য, কোনও রকম সাহায্য তাদের কাছ থেকে পাওয়া তো যায়ই না, উলটে নানা ঝামেলায় ফেলে দেয়—এই জাতীয় একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু দীপঙ্কর পালিত এসবের বাইরে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সবাই যে নষ্ট হয়ে যায়নি, এখনও যে অনেক ভদ্রলোক আছেন, মানুষকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে থাকেন, দীপঙ্কর তাঁদেরই একজন। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। অত্যন্ত সহৃদয়, মুখে সারাক্ষণ হাসি, কথাবার্তায় চমৎকার। সঞ্চারীর বিবাহিত জীবন যেভাবে শেষ হয়েছে তাতে বেশ দুঃখই পেয়েছেন। তার প্রতি এই অফিসারটির অপার সহানুভূতি। সেও তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করে।

দীপঙ্করকে ফোনে পেয়ে গেল সঞ্চারী। নিজের এবং এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে, সব জানিয়ে বলল, 'স্যার, আপনাকে একটু কষ্ট দেব।'

বয়সে অনেক ছোট সঞ্চারীকে প্রথম দিকে 'আপনি' করে বলতেন দীপঙ্কর। পরে 'তুমি'। ডিভোর্সের পরও অমরনাথ এবং প্রতিমার সঙ্গে সম্পর্কটা এখন কিরকম, তাঁরা সঞ্চারীর ওপর কতখানি নির্ভর করেন, এই মেয়েটির ওপর তাঁদের কতটা আস্থা, সবই জানেন দীপঙ্কর। হালকা গলায় জবাব দিলেন, 'কষ্ট আবার কী। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস।' একটু থেমে, কী ভেবে জিগ্যেস করলেন, 'কী করতে হবে বল—'

'আপনাকে এখনই এ বাড়িতে একবার আসতে হবে। জানি আপনি ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। হয়তো এই মোমেন্টে কোনও ঝঞ্ঝাট সামলাতে হচ্ছে। তবু এখানে আসাটা ভীষণ আর্জেন্ট। আমি আপনার জন্যে ওয়েট করছি।'

সঞ্চারীর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে ওঠেন দীপঙ্কর।—'এনিথিং সিরিয়াস?'

'ভেরি সিরিয়াস।'

'আমি এক্ষুনি আসছি।'

॥ পাঁচ ॥

মিনিট পনেরোর মধ্যে দীপঙ্কর পৌঁছে গেলেন। অমরনাথদের বেডরুমে সঞ্চারী তো রয়েছেই, তারাপদ এবং মলিনাও আছে। খুব সম্ভব এ বাড়ির বিবাহ-বিচ্ছিন্ন বধূটির দৌড়টা কতদূর সেটাই ওরা দেখতে চাইছিল।

দীপঙ্করকে বেডরুমেরই একটা সোফায় বসিয়ে তারাপদ আর তার স্ত্রীর সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানিয়ে সঞ্চারী বলল, 'এরা আমার শ্বশুর-শাশুড়ির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। দু'টি অসুস্থ বুড়ো মানুষকে টাকার জন্যে ক্রমাগত প্রেসার দিয়ে চলেছে।'

দীপঙ্কর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তারাপদদের দেখে সঞ্চারীর দিকে চোখ ফেরালেন।—'তারপর?'

'অফিসের কাজে ক'দিন এত ব্যস্ত ছিলাম যে এ বাড়িতে আসতে পারিনি। তারাপদবাবুদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঁরা বার বার আমাকে ফোন করেছেন। আজ আমার কাজের চাপ কিছুটা কমে যাওয়ায় এখানে এসে সব শুনলাম।'

'তোমরা কী চাইছ?'

'এই ট্রেসপাসারদের এখান থেকে বার করে দিতে। ওদের এক ঘণ্টা সময় দিয়েছি। বাট দে রিফিউজ টু লিভ। এখানেই ঘাঁটি গেড়ে থাকতে চাইছে।'

দীপঙ্করের চোখ অমরনাথদের দিকে ঘুরে গেল।—'এটা কি ঠিক, সঞ্চারী যা বলছে, মানে তারাপদবাবুরা এখান থেকে বিদায় হন, আপনারাও তাই চাইছেন?'

অমরনাথ এবং প্রতিমা একসঙ্গে বলে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই। বউমা এ বাড়ির সমস্ত ব্যাপারে যে ডিসিশান নেবে সেটা আমরা চোখ বুজে মেনে নেব। কারণ ওর চেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী আমাদের আর কেউ নেই।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অমরনাথ ফের বলেন, 'অফিসার, এই তারাপদরা ছাড়াও আমাদের অন্য আত্মীয়রা এসে মাঝে মাঝেই হামলা করছে। তাদের সবার এক কথা—টাকা চাই। এটা লিখে দাও, ওটা লিখে দাও।'

দীপঙ্করের মুখ কঠোর হয়ে ওঠে। তারাপদর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'অমরনাথবাবুরা কী বললেন, শুনেছেন তো?'

তারাপদ উত্তর দিল না, নীরবে তাকিয়ে থাকল। তবে মলিনা অত্যন্ত ধুরন্ধর

মহিলা। অত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী সে নয়। বলল, 'শুনেছি। কিন্তু আমাদেরও কিছু বলার আছে।'

'বলুন—' দীপঙ্কর মলিনার দিকে তাকান।

মলিনা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়, অমরনাথদের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক। তাদের চেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী ওঁদের আর কেউ নেই। অমরনাথদের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তার ওপর ভীষণ অসুস্থ। কিসে তাঁদের ভালো, কিসে মন্দ, সেসব তলিয়ে বোঝার মতো বোধবুদ্ধি অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে। এসময় আপনজনদের তাঁদের কাছে থাকা খুবই জরুরি। সঞ্চারীর নাম না করে জানালো, বাইরের অবাঞ্ছিত লোক বদ মতলবে এসে জুড়ে বসতে চাইছে। এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সঞ্চারী জরাগ্রস্ত দু'টি বয়স্ক মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অমরনাথদের মন বিষিয়ে তুলেছে। দীপঙ্কর একজন বুদ্ধিমান, দক্ষ অফিসাব। তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাক্তন শ্বশুরবাড়িতে কী কারণে সঞ্চারী জোঁকের মতো সেঁটে আছে সেটা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। তাই দু'টি রুগ্ণ, অসহায়, প্রায়-শয্যাশায়ী মানুষের কথা বিবেচনা করে তিনি মলিনাদের বাড়িতে থাকতে দেবেন। অন্যরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘুরঘুর করে। শুধু আপনজনরাই নিঃস্বার্থভাবে, কোনও প্রতিদানের আশা না করে, অমরনাথদের সেবা শুশ্রূষা করতে পারে।

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছিলেন দীপঙ্কর। ধীরে ধীরে বললেন, 'অমরনাথবাবুদের আমি চিনি। তাঁরা নানা রোগে অনেক কাল ভুগছেন ঠিকই কিন্তু বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে বা তাঁদের সেনিলিটিতে ধরেছে, এমনটা ভাবার কারণ নেই। অমরনাথবাবুরা পরিষ্কাব বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা চান না, আপনারা এখানে থাকুন। তবু জোর করে থাকতে চাইছেন?'

মলিনার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে জবাব দেয় না।

দীপঙ্কর থামেন নি, 'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনি সঞ্চারী দেবী সম্পর্কে অনেক খারাপ ইঙ্গিত দিয়েছেন। কৌশলে অমরনাথবাবুদের টাকাপয়সা আত্মসাৎ করার জন্য তিনি এখানে পড়ে আছেন। তাঁর মুখে ভালোমানুষির মুখোশ আঁটা। কিন্তু এই মহিলাকে আমি অনেকদিন ধরেই চিনি। ডিভোর্সের সময় কয়েক লক্ষ টাকা তিনি কমপেনসেশন আদায় করতে পারতেন। একটা পয়সাও নেন নি। তাঁর আত্মসম্মান বোধ প্রবল। তিনি নিজের থেকে এখানে আসতে চান না।

অমরনাথবাবুরা তাঁর ওপর নির্ভর করেন, তাঁকে বিশ্বাস করেন। তাঁদের প্রয়োজনেই সঞ্চারীদেবীকে এখানে আসতে হয়। অকারণে তাঁর বদনাম করবেন না।

তারাপদ মিনমিন করে কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু তার আগেই দীপঙ্করের এক ধমকে কুঁকড়ে গেল। 'বাড়ির মালিকদের আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে এঁদের ঘাড়ে চেপে ছিলেন। এবার ছেড়ে দিলাম। পরে যদি এখানে ঢোকার চেষ্টা করেন, ট্রেসপাসিংয়ের চার্জে থানায় নিয়ে এমন ব্যবস্থা করব, লাইফে ভুলবেন না। নাউ ক্লিয়ার আউট—'

'আচ্ছা স্যার, আপনি যখন বলছেন—'

স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে তারাপদ এবং মলিনা, দু'জনেই একবার সঞ্চারীর দিকে তাকায়। তাদের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। চাপা গলায় তারাপদ বলল, 'এই অপমানটা আমার মনে থাকবে। শোধ তুলে ছাড়ব।'

দীপঙ্কর তাকে দাবড়ে দিলেন।—'ডোন্ট থ্রেটেন হার। যদি সঞ্চারীর কোনও ক্ষতি হয়, তোমার একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না।'

তারাপদরা চলে যাবার পর সঞ্চারী বলল, 'এদের না হয় ভাগানো গেল। কিন্তু আরও ডজন ডজন আত্মীয়স্বজন রয়েছে। তারাও তো ছাড়ছে না।'

দীপঙ্কর হাসলেন।—'তাদেরও ব্যবস্থা হবে। তুমি জাস্ট একটা ফোন করে দিও। তবে—'

'তবে কী?'

'অমরনাথবাবুদের রিলেটিভদের আটকাতে পারব কিন্তু তাদের মুখে তালা লাগানো অসম্ভব। তারা কিন্তু নোংরা নোংরা কথা বলে বেড়াবে।'

সঞ্চারী বলল, 'জানি। মানুষের জিভে বিষ থাকে। স্বার্থে ঘা পড়লে তারা তা উগরে দেবেই। কিন্তু কী আর করা যাবে।'

আস্তে মাথা নেড়ে সায় দিলেন দীপঙ্কর। তারপর উঠে পড়েন, 'এখানকার কাজ তো মিটল। এখন চলি—' বিদায় নিয়ে তিনি চলে যান।

হঠাৎ ওয়াল ক্লকের দিকে নজর পড়তে চমকে ওঠে সঞ্চারী। বারোটা বেজে সতেরো। তারাপদদের ঝঞ্ঝাট মেটাতে মেটাতে অনেক দেরি হয়ে গেল। সাড়ে ন'টায় তার অফিসে পৌঁছনোর কথা। আজ ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। ক'বছর 'আশ্বাস'-এ কাজ করছে সে। কখনও সখনও জ্বর-টর বা অন্য অসুখ বিসুখ হলে ছুটি নিয়েছে। কিন্তু সুস্থ থাকলে কোনও দিন অফিসে লেট হয়নি।

সঞ্চারী ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে।—'আমাকে এবার যেতে হবে।'

সে দরজার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ অমরনাথ এবং প্রতিমার কিছু মনে পড়ে যায়।

প্রতিমা তাঁর স্বামীকে বললেন, 'বউমাকে সেই কথাটা তো বলা হল না।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—' অমরনাথের চোখেমুখে রীতিমতো চাঞ্চল্য ফুটে ওঠে। সঞ্চারীকে বললেন, 'আর মিনিট দশেক বসে যাও। দরকারী কিছু কথা আছে।'

তারাপদ আর মলিনা যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তা কেটে গেছে। তারপরও কী প্রয়োজন থাকতে পারে, আন্দাজ করতে পারে না সঞ্চারী। সে অবাক হল ঠিকই, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করল না। ফের বসে পড়ল।

অমরনাথ বললেন, 'তুমি তো সারাক্ষণ এ বাড়িতে থাকো না। তারাপদদের মতো বজ্জাত আত্মীয়স্বজন আমাদের যে আরও অনেকেই রয়েছে, সেটা তোমার ভালো করেই জানা। এরা সহজে আমাদের ছাড়বে না। যতই ওসি ভরসা দিন, ওরা উৎপাত করবেই। এই ওসি ভদ্রলোক, মিস্টার পালিত যে চিরকাল এখানকার থানায় থাকবেন তার তো ঠিক নেই। ওঁকে হয়তো ট্রান্সফার করে দেওয়া হল। ওঁর জায়গায় যিনি এলেন, তিনি যে ওঁর মতোই হবেন, জোর দিয়ে কি বলা যায়? আমি কী বলতে চাইছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

অবশ্যই বুঝতে পেরেছে সঞ্চারী। নতুন ওসি যিনি আসবেন তিনি সহৃদয়, সহানুভূতিশীল নাও হতে পারেন। হয়তো লোকটা হবে ঘুষখোর, তার ব্যবহার হবে খুবই খারাপ, তার কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্যই পাওয়া যাবে না। আস্তে মাথা নাড়ে সঞ্চারী।—'হ্যাঁ।'

'তাই তোমার শাশুড়ি-মা আর আমি আত্মীয়দের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্যে একটা উপায় বার করেছি।'

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সঞ্চারী।

এবার প্রতিমা বললেন, 'তোমাকে একটা অনুরোধ করব। 'না' বলতে পারবে না কিন্তু।'

স্ত্রীর কথায় সায় দিলেন অমরনাথ।

সামান্য অস্বস্তি বোধ করে সঞ্চারী। কী অনুরোধ সেটা না জানিয়ে আগেভাগে কড়ার করিয়ে নিতে চাইছেন অমরনাথরা। সে বলে, 'আমাকে কি কিছু করতে হবে?'

অমরনাথ বলেন, 'হ্যাঁ।'

'বলুন—'

'আমরা তোমাকে একটা জিনিস দিতে চাই। সেটা তুমি নেবে। নিতেই হবে।'

বিস্ময়ের মাত্রাটা অনেকখানি বেড়ে যায় সঞ্চারীর। বলে, 'জিনিসটা কী না শুনে—' বলতে বলতে থেমে যায়।

'তুমি তো জানো এই বাড়িটা ছাড়া আমাদের আরও যে তিনটি বাড়ি আছে। সেগুলো থেকে প্রচুর ভাড়া পাই। আমাদের ভালোই চলে যায়। তা ছাড়াও ব্যাঙ্কে রয়েছে কয়েক লাখ টাকা। ধর চল্লিশ লাখের মতো। সেগুলো লং টার্মে ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে। আমরা কোনও ইন্টারেস্ট তুলি না ; দরকার হয় না। ওগুলো সুদে বাড়ছে। এই টাকা থেকে তিরিশ লাখ তোমার নামে করে দিতে চাই।'

সঞ্চারী প্রথমটা স্তম্ভিত। ঠিক শুনছে তো! পরক্ষণে তার সারা শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায়। বলে, 'কী বলছেন আপনারা!'

অমরনাথ এবং প্রতিমা দু'জনে মিলে তাকে বোঝাতে থাকেন। বাড়িগুলো আপাতত তাঁদের নামেই থাকবে। সেগুলো কাকে বা কাদের দিয়ে যাবেন, ভেবে চিন্তে পরে উইল করবেন। দুশ্চরিত্র বদ ছেলেকে বাড়িগুলো লিখে দিলে তার কী গতি হবে, সেটা তাঁদের ভালোই জানা আছে। পূর্বপুরুষের এইসব সম্পত্তি ওঁদের মৃত্যুর পর খুব বেশিদিন থাকবে না। জয়দীপ সেসব বেচে টেচে দেবে। কিন্তু নগদ টাকার কিছুটা সঞ্চারীর নামে করে রাখলে সেটা আপাতত হাঙর-কুমিরের মতো আত্মীয়-স্বজনদের হাত থেকে বাঁচানো যাবে।

সঞ্চারীর মাথা ঘুরছিল। বলল, 'দেখুন টাকা পয়সা বা প্রপার্টির লোভে আমি আপনাদের এখানে আসি না। আপনারা অসুস্থ, সারা বছরই নানা রোগে ভোগেন। আপনাদের কাছে অনেক স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি। এখনও পাই। আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন, আমার খুব খারাপ লাগে। তাই রোজ এসে খবর নিয়ে যাই।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু চুপ করে থাকে সে। তারপর ধীরে ধীরে বুকে বাতাস টানতে টানতে ফের শুরু করে, 'জয়দীপের সঙ্গে ডিভোর্সের পর অ্যালিমনি আপনারা দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিইনি। একসঙ্গে অনেক টাকা কমপেনসেশনও দেবার কথা বলেছিলেন। আমি রাজি হইনি। এখন আবার টাকা লিখে দেবার কথা বলছেন। অবশ্য আপনাদের কথায় যুক্তি আছে। আত্মীয়-স্বজনরা যেভাবে হামলে পড়েছে তাতে এটা ছাড়া হয়তো আপনাদের সামনে অন্য কোনও পথ

খোলা নেই। কিন্তু এ আমি নিতে পারব না। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। এ বাড়িতে কোনও প্রত্যাশা নিয়ে আসি না।'

অমরনাথ বললেন, 'তুমি যে নির্লোভ, কোনওরকম স্বার্থ নিয়ে এখানে আসো না, তা আমাদের চেয়ে কে আর ভালো জানে। কিন্তু এছাড়া আমাদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। এতে তোমার অসম্মান হবে না। যখন বুঝব বিপদ কেটে গেছে, টাকাটা ফিরিয়ে নেব। তা হলেই হবে তো?'

গোড়ার দিকে অনড় থাকলেও পরে সঞ্চারী বুঝতে পারে, অমরনাথদের অনুরোধটা কোনও রকম অনুগ্রহ নয়। দান করে তাঁরা তার অমর্যাদা করতে চাইছেন না। নিজেদের বাঁচানোর জন্য তার নামে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রাখার কথা বলেছেন।

তবু অস্বস্তিটা পুরোপুরি কাটছে না সঞ্চারীর। সে বলে, 'এতগুলো টাকা পেলে আমার মাথা ঘুরেও তো যেতে পারে।'

'কিরকম?'

'ধরুন টাকাটা আপনারা আর ফেরত পেলেন না।'

প্রতিমা গভীর গলায় বললেন, 'তোমাকে আমরা জানি সঞ্চারী। আগেও অনেকবার বলেছি, এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে অন্য কারওকে আমরা বেশি বিশ্বাস করি না। এটাও জানি, মরে গেলেও তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।'

অনেকক্ষণ নীরবতা।

তাবপর সঞ্চারী দ্বিধার সুরে বলে, 'একটা কথা আপনাদের জানাব জানাব করেও জানানো হয়নি। শুনবেন?'

অমরনাথরা দু'জনেই অসীম আগ্রহে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'একটি ছেলের সঙ্গে কিছুদিন হল আমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সেটা বন্ধুত্বের চাইতেও বেশি। আমার প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতি। নানা ব্যাপারে সে আমাকে সাহায্য করে।'

এমন একটা খবরের জন্য বুঝিবা প্রস্তুত ছিলেন না অমরনাথরা। ভেতরে ভেতরে হয়তো ধাক্কা লাগল। বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও এ বাড়িতে সঞ্চারীর যাতায়াত বজায় থাকবে, সে তাঁদের দেখাশোনা করবে, বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াবে—এটাকেই তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধরে নিয়েছিলেন।

ধাক্কাটা সামলাতে খানিকটা সময় লাগল অমরনাথদের। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলেটি, অর্থাৎ দীপকের সম্বন্ধে সমস্ত জেনে নিলেন।

সঞ্চারী বলল, 'দীপক এখন পর্যন্ত বিয়ের কথা বলেনি। বন্ধুত্ব এক জিনিস, বিয়ে পুরোপুরি অন্য ব্যাপার। এই নিয়ে আমি ওকে কোনও আগ্রহ দেখাই নি। আপনারা জানেন, আমার ক্যারেক্টারে কোনও রকম হ্যাংলামো নেই। তবে—'

'কী?'

'আমার ধারণা, দীপক হয়তো কোনও দিন বিয়ের কথা বলবে।'

প্রতিমা দম-আটকানো গলায় জিগ্যেস করেন, 'বিয়ের পর তুমি কি দিল্লি চলে যাবে?'

প্রতিমার মনোভাবটা লহমায় আঁচ করে নেয় সঞ্চারী। সে হেসেই ফেলে।—'আগে প্রোপোজাল দিক। তারপর তো বিয়ে। যদি সেটা হয়েই যায়, দিল্লি যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এখানে আমার মা আছে, বেকার ভাই আছে, আমার চাকরি আছে, আপনারা আছেন। সব ফেলে দিল্লি চলে গেলেই হল?' তার মুখ থেকে ধীরে ধীরে হাসিটা মুছে যায়।

কিন্তু অমরনাথ আর প্রতিমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভেতর থেকে একটা দ্যুতি বেরিয়ে আসছে যেন। প্রতিমা বললেন, 'হ্যাঁ, এখানে কি তোমার কম দায়িত্ব! কতগুলো মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

সঞ্চারী সোজাসুজি প্রাক্তন শাশুড়ির দিকে তাকায়।—'আমি কিন্তু অন্য একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী সেটা?'

'ধরুন বিয়েটা হল। আমি দিল্লি গেলাম না, এখানেই থাকলাম। কিন্তু আপনাদের টাকাটা আমার নামে রয়ে গেল। এদিকে যে মানুষটা আমার জীবনে এসেছে, অতগুলো টাকার ব্যাপারে তারও তো লোভ হতে পারে?'

অমরনাথ হেসে হেসে বললেন, 'আবার সেই বিশ্বাসের কথাটা উঠছে। আমরা জানি তোমার মতো মেয়ে তাকে লোভী হতে দেবে না।'

তার ওপর অমরনাথদের কত যে আস্থা! সঞ্চারী অভিভূত হয়ে যায়। তবু বলে, 'কিন্তু অন্য একটা সমস্যাও যে থেকে যাচ্ছে।'

'কিসের সমস্যা?'

সঞ্চারী জানায়, অমরনাথ এবং প্রতিমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তা ছাড়া দু'জনেই নানা রোগে জর্জরিত। মানুষ অনন্ত পরমায়ু নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি। ওঁদের ভালোমন্দ যদি কিছু হয়ে যায়, এই বিশাল অঙ্কের টাকার কী হবে?

অমরনাথ বলেন, 'এই নিয়ে এখন থেকে এত চিন্তা করছ কেন? অমরত্ব নিয়ে না এলেও, দু'-চার বছরের ভেতর মারা যাব বলে মনে হয় না। আর তেমন কিছু যদি ঘটেই, টাকাটা সম্বন্ধে তুমিই সিদ্ধান্ত নেবে। কোনও সৎ কাজে ওটা খরচ কোরো।'

অর্থাৎ কোনও অজুহাতই ওঁরা কানে তুলবেন না। সঞ্চারী বলল, 'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

'এর মধ্যে ভাবাভাবির কিছু নেই। আমরা কিন্তু ব্যাঙ্কে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সব ব্যবস্থা করছি।'

সঞ্চারী উত্তর দিল না। কী উত্তরই বা দেবে? কোনও আপত্তিই অমরনাথরা শুনবেন না। একসময় উঠে পড়ল সে।

॥ ছয় ॥

মাসখানেক কেটে গেছে।

এর ভেতর টাকাটা সঞ্চারীর নামে করে দিয়েছেন অমরনাথরা। তারাপদ আর মলিনা বোধহয় নজর রেখেছিল। খবরটা ঠিক পেয়ে গেছে এবং অন্য আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে চাউর করে দিয়েছে। শুধু তাই না, বাঙ্গালোরে ফোন করে জয়দীপকেও জানিয়েছে।

তারাপদরা বিষাক্ত সরীসৃপের চেয়েও যে সাঙ্ঘাতিক, সেটা আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল। এবার আরও হিংস্রভাবে তারা ছোবল হানতে লাগল। সকাল বিকেল রাত্তির—সময়ের ঠিকঠিকানা নেই, অনবরত ফোন করে করে বিষ ঢেলে চলেছে।

'আসল চেহারাটা এবার বেরিয়ে পড়েছে, তাই না? হারামজাদী, নচ্ছার মেয়েমানুষ। ডিভোর্সের পর কেন পুরনো শ্বশুরবাড়িতে ঘোরাঘুরি করিস, তোর সেই মতলবটা আমরা অনেক আগেই ধরে ফেলেছিলাম। তোর মতো অ্যাকট্রেস দুনিয়ায় আর একটাও জন্মায়নি। সিনেমায় কি স্টেজে নামলে অনেক মহানায়িকার নাক কেটে নিতে পারতিস। অমরনাথদা আর প্রতিমা বউদিটা হদ্দ বোকা। সৎ সেজে, ওয়েল-উইশারের মুখোশ পরে, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্যি লাখ লাখ হাতিয়েছিস। বাকি প্রপার্টি কবে গর্ভে ঢোকাবি—কিরে?'

তার মোবাইলের নম্বর কিভাবে তারাপদরা জোগাড় করেছে, সঞ্চারী ভেবে

পায় না। তবে ওরা যে ধরনের ধূর্ত, ফন্দিবাজ, তাতে ওদের পক্ষে সমস্ত কিছুই সম্ভব। একটা ফোন নাম্বার জোটানো তো জলভাত।

নাম্বারটা অন্য আত্মীয়দেরও দিয়েছে তারাপদ। তারাও বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে, 'তোমাকে তো ভালো মেয়ে বলে জানতাম। এখন এসব কী শুনছি! তোমার মাথায় যে এত কুবুদ্ধি ছিল, ভাবতে পারিনি। দু'টো অসুস্থ বুড়ো মানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে অতগুলো টাকা বাগিয়ে নিলে! ছি ছি—'

কেউ বলে, 'ডিভোর্সের পর ভালোমানুষ সেজে বলেছিলে, অ্যালিমনি কমপেনসেশন কিচ্ছু নেবে না। তখন নিলে কত আর পেতে! বড়জোর মাস্থলি চার-পাঁচ হাজার, নইলে এক থোকে ছ'-সাত লাখ। সেই জায়গায় তিরিশ লক্ষ। মা জননী, তোমার বুদ্ধি আছে, কিন্তু লজ্জা, আত্মসম্মান বোধ এক ফোঁটাও নেই। তুমি কি মানুষ! সন্দেহ হচ্ছে, মানুষের রক্ত তোমার শরীরে বইছে কিনা। গলায় দড়িও জোটে না? পৃথিবীতে বিষের কি আকাল পড়ে গেছে?'

অমরনাথদের আত্মীয়রা সামনাসামনি আসছে না বা ওঁদের বাড়ি গিয়ে চড়াও হচ্ছে না। শুধু সঞ্চারীকেই ফোন করে চলেছে। কোনও রকম হুমকি টুমকি দিচ্ছে না। শুধু হুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে অবিরাম বিষ ঢেলে যাওয়া। এ এমন এক ব্যাপার, পুলিশকে জানিয়ে কোনও লাভ নেই। দীপঙ্কর তো স্পষ্ট করে বুঝিয়েই দিয়েছিলেন, আত্মীয়রা অমরনাথদের বাড়ি এসে ভয় টয় দেখালে বা চড়ে বসলে তক্ষুনি তাদের ঘাড় ধরে বার করে দেবেন। কিন্তু তাঁদের মুখ বন্ধ করা অসম্ভব। এ বিষয়ে তিনি অপারগ।

এদিকে ধিক্কারের পর ধিক্কার। শ্লেষের পর শ্লেষ। কোনও একজন থামে তো আরেক জন শুরু করে দেয়। একেক দিন মাঝরাতেও ওদের ফোন আসে। মোবাইলটার যে সুইচ অফ করে রাখবে তারও উপায় নেই। 'আশ্বাস'-এ যে মেয়েদের নিয়ে তাদের কাজ, তারা কে কখন কী করে বসবে তার ঠিক নেই। তেমন সমস্যা দেখা দিলে অফিস থেকে যে কোনও সময় ফোন আসতে পারে। রাত বেশি হলে অতদূর যাওয়া সম্ভব নয়। তবে ফোনে সব শুনে, কী করতে হবে তার পরামর্শ দিতে হয় সঞ্চারীকে।

অমরনাথদের আত্মীয়রা বিষাক্ত পোকার মতো অনবরত কামড় দিয়েই চলেছে। অতিষ্ঠ সঞ্চারী প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে গিয়ে রোজই বলে, 'দয়া করে টাকাটা ফেরত নিন। আপনাদের রিলেটিভরা আমাকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।

নোংরা ভাষায় গালাগালি করছে। আমি চোর, আমি বজ্জাত, আমি এই, আমি সেই। আপনাদের স্রেফ বোকা বানিয়ে টাকাটা আদায় করেছি। ওদের জ্বালায় দিনে-রাতে এক মুহূর্ত আমার শান্তি নেই। সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকি, এই বুঝি ওদের ফোন এল।'

পিঠে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অমরনাথ এবং প্রতিমা বোঝান, 'তুমি তো শক্ত মেয়ে। জীবনে কত ঝড়-ঝাপটা সামলেছ। এটুকু পারবে না?'

'পারছি কোথায়? আমার নার্ভ ছিঁড়ে পড়ছে।'

'দেখ বউমা, নিজের বিবেকের কাছে তুমি পরিষ্কার। ভালো করেই জানো, কোনও অন্যায় করনি। তোমার আপত্তি কানে না তুলে আমরাই টাকাটা তোমার নামে করে দিয়েছি। কে কী বলল তা নিয়ে মন খারাপ কোরো না।'

'কিন্তু—'

সঞ্চারীকে থামিয়ে দিয়ে এবার প্রতিমা বলেন, 'রাস্তায় কুকুরের পাল চেঁচায় না? সেই ভয়ে কি লোক ঘরে বসে থাকে? টাকা পায়নি, সেই জ্বালায় ওরা খেপে উঠেছে। কদ্দিন আর? ওদের ঘেউ ঘেউ ঠিক থেমে যাবে।'

হঠাৎ সঞ্চারীর মনে হয়, এঁরা ঠিকই বলছেন। সে যদি টাকাটা ফেরত দেয়, আত্মীয়-স্বজনেরা দুই অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ওপর হামলা চালাতে শুরু করবে। মন শক্ত করে নেয় সে। শুধু টাকাই না, এঁদের প্রপার্টিও তাকেই রক্ষা করতে হবে।

আত্মীয়-পরিজনদের উৎপাত তো ছিলই। তার ভেতর একদিন বাঙ্গালোর থেকে জয়দীপের ফোন এল।—'তোমার নামে এসব কী শুনছি?'

তারাপদর নাম করে সঞ্চারী পালটা প্রশ্ন করেছে, 'এই লোকটা তোমাকে নিশ্চয়ই জানিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক শুনেছ। টাকার অ্যামাউন্টটা তারাপদ কি তোমাকে বলেছে?'

'বলেছে কয়েক লাখ।'

'এগ্‌জাক্ট ফিগারটা হল তিরিশ লক্ষ।'

'ওয়ান্ডারফুল—' তীব্র, ঝাঁঝালো গলায় জয়দীপ বলতে লাগল, 'ডিভোর্সের সময় আমরা পাঁচ সাত লাখ দিতে চেয়েছিলাম। তুমি বলেছিলে আই হেট ইট, এভাবে টাকা নিতে তোমার সেলফ-রেসপেক্টে বাধে। এখন আমার মা-বাবাকে ধোঁকা দিয়ে তার সিক্স টাইমস বাগিয়ে নিয়েছ। তোমার সেই টনটনে আত্মসম্মান বোধটা কোথায় গেল?'

'সেটা ঠিকই আছে।'

'ও টাকা তুমি পেতে পার না। মা-বাবাকে ইমিডিয়েটলি ফিরিয়ে দেবে। ওই টাকা আমার প্রাপ্য। উত্তরাধিকারী হিসেবে।'

এই দুশ্চরিত্র, বদ লোকটা যে তাদের বংশের দুই গালে চুনকালি লাগিয়ে দিয়েছে সে কিনা অমরনাথ এবং প্রতিমার উত্তরাধিকার দাবি করছে! খুব ঠাণ্ডা গলায় সঞ্চারী বলল, 'টাকাটা আমি কোনওভাবেই ফেরত দিচ্ছি না। কারণ তোমার বা তোমার রিলেটিভদের হাতে গেলে তার কী গতি হবে তা জানেন বলেই তোমার বাবা-মা ওটা আমাকে দিয়েছেন।'

কণ্ঠস্বরে বিষ মিশিয়ে জয়দীপ বলল, 'আর তুমি সেটা পুণ্যকর্মে খরচ করবে, তাই তো?'

'এখনও ঠিক করিনি। তবে কোনও কারণেই টাকাটা নষ্ট করব না।' বলে একটু চুপ করে থেকে সঞ্চারী ফের শুরু করে, 'তোমার মা-বাবা তোমাকে টাকা না দিয়ে আমার নামে কেন আপাতত লিখে দিয়েছেন সেটা ভেবে দেখেছ?'

জয়দীপ উত্তর দেয় না।

সঞ্চারী থামে নি, 'কারণ তুমি এমন সুসন্তান যে তোমার মা-বাবাও তোমাকে বিশ্বাস করেন না। অথচ আমি এখন তাঁদের কেউ না, আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, তবু আমার ওপর ওঁদের অগাধ ভরসা। টাকাটা যদি তাঁদের নামে থাকে, দু'জনের মৃত্যুর পর আল্টিমেটলি তুমিই পাবে। তার মানে টাকাগুলো স্রেফ জলে যাবে। আমাকে দিয়ে যতটা বাঁচানো যায়—'

'তোমার লেকচারবাজি বন্ধ কর।'

'ঠিক আছে, বন্ধ করছি। কঠিন সত্যি কথা শুনতে কার আর ভালো লাগে।'

জয়দীপ বলে, 'ওই টাকাটা ছাড়াও আমাদের অনেক প্রপার্টি আছে। সেসব কিন্তু মা-বাবা তোমাকে লিখে দেয় নি। আমিই পাব।'

সঞ্চারী বলে, 'যদি বেঁচে থাকতে থাকতে তোমার বাবা-মা অন্য প্রপার্টির অ্যারেঞ্জমেন্ট না করে যান সেগুলোর কী দশা হবে বুঝতেই পারছি।'

ব্যঙ্গের সুরে চিবিয়ে চিবিয়ে জয়দীপ বলে, 'প্রপার্টি আমাদের। দুশ্চিন্তাটা দেখছি তোমার। চমৎকার!'

সঞ্চারী বলে, 'তোমার মা-বাবার মুখেই শুনেছি তোমাদের পূর্বপুরুষেরা সৎ পথে বিষয়সম্পত্তি করেছেন। টাকা জমিয়েছেন। নিশ্চয়ই সেসব উড়িয়ে ঝুড়িয়ে দেবার জন্যে নয়।'

বিদ্রূপের মাত্রাটা কয়েক গুণ বেড়ে যায় জয়দীপের। বলে, 'অন্যের প্রপার্টি বাঁচাবার জন্যে এভাবে মাথা ঘামাতে আগে আমি আর কারওকে দেখি নি। আমাদের মতো আরও কতজনের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব নেবার কথা ভাবছ? নাকি নিয়ে বসে আছ?'

ঠাণ্ডা গলায় সঞ্চারী বলে, 'এখনও কেউ বলে নি। তবে দায়িত্ব দিলে নেবার কথা নিশ্চয়ই ভাবব।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

আচমকা হুমকির সুরে চেঁচিয়ে ওঠে জয়দীপ, 'এক উইকের ভেতর টাকাটা তোমাকে ফেরত দিতেই হবে। দিলে কিনা, এই বাঙ্গালোরে বসেই তা জানতে পারব।'

ভেতরে জ্বালা অনুভব করছিল সঞ্চারী, সেই সঙ্গে অসহ্য ক্রোধ। তবু যতটা সম্ভব নিজেকে শান্ত রাখল সে। জিগ্যেস করল, 'যদি ফেরত না দিই?'

'কলকাতায় আমার ল'ইয়ারকে তোমার এগেনস্টে কেস ফাইল করতে বলব।'

'কোন গ্রাউন্ডে?'

'আমার মা-বাবার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। তাদের সেনিলিটিতে ধরেছে। ডিভোর্সের পরও যে শ্বশুরবাড়িতে রেগুলার যাতায়াত করছ তার পেছনে একটাই মোটিভ ছিল। তুমি যে একটি নাম্বার ওয়ান চিট, জোচ্চুরি করে ফর্মার শ্বশুর-শাশুড়িকে ধোঁকা দিয়ে টাকাটা লিখিয়ে নিয়েছ তা প্রুভ করতে আমার ল'ইয়ারের দশ দিনও লাগবে না। তুমি সোজা জেলখানায় গিয়ে ল্যান্ড করবে।'

মাথায় রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। এবার আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না সঞ্চারী। একেবারে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছাড়ল।—'বদ, লম্পট, তুমি আমাকে কোর্টের ভয় দেখাচ্ছ? জেলে পাঠাবে বলে শাসাচ্ছ? একটা পয়সাও ফেরত দেব না। যা ইচ্ছা, করতে পার।' বলে লাইন কেটে দিল।

॥ সাত ॥

জয়দীপের শাসানিটা যে ফাঁপা তর্জন গর্জন নয়, দিন কয়েকের ভেতর টের পাওয়া গেল। কোর্ট থেকে নোটিশ এল সঞ্চারীর বিরুদ্ধে। অমরনাথ এবং

প্রতিমাকে প্রতারণা করে তিরিশ লাখ টাকা লিখিয়ে নেবার অভিযোগ করা হয়েছে।

জয়দীপের হুমকিটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল সঞ্চারী কিন্তু সত্যিই যে কেস করবে ভাবা যায়নি। ভীষণ ঘাবড়ে গেল সে। ডিভোর্সের সময় বেশ কয়েক বার তাকে কোর্টে ছোটাছুটি করতে হয়েছিল। অভিজ্ঞতাটা সুখকর নয়। আদালত সম্পর্কে তার রীতিমতো অস্বস্তি এবং ভয় রয়েছে।

ত্রস্ত সঞ্চারী প্রথমে ছুটে গিয়েছিল অমরনাথদের কাছে। দু'জনেই বলেছেন, উৎকণ্ঠার কোনও কারণ নেই। অর্থ তাঁরা স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে দিয়েছেন। সঞ্চারী তাঁদের প্রতারণা করেনি, টাকা আদায়ের জন্য সে কোনও কূট কৌশলের আশ্রয় নেয়নি। সমস্ত ব্যাপারটাই স্বচ্ছ। কোনও গোলমাল নেই। তবু যদি সমস্যা দেখা দেয়, নিজেদের লেটার-হেডে হাতে লিখে সই করে দেবেন। বার্ধক্যের কারণে ভীমরতিতে ধরলে কেউ এভাবে লিখে দিতে পারে না।

সঞ্চারীর উদ্বেগ কিছুটা কাটলেও দুর্ভাবনাটা পুরোপুরি মাথা থেকে বার করে দিতে পারল না। প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়ির চিঠিতে কোনও কাজ হবে কিনা, বিচারক তা আদৌ মানবেন কিনা, কে জানে। টেনশন থেকে মুক্তি পাচ্ছে না সঞ্চারী। সারাক্ষণ পাষাণভারের মতো সেটা মাথায় চেপে আছে। সে ঠিক করে ফেলল, কেসের তারিখ পড়ার আগে একজন আইনজ্ঞের পরামর্শ নেবে।

তাদের 'আশ্বাস'-এর আশ্রিত মেয়েদের নিয়ে অনেক সময় মামলা-টামলা হয়। সেসব সামলানোর জন্য একজন বাঁধা অ্যাডভোকেট আছেন। শিবশঙ্কর হালদার। হরিদেবপুরে তাঁর বাড়ি। সঞ্চারীদের হাউসিং কমপ্লেক্স থেকে বেশি দূরে নয়। এক রবিবার সকালে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করল সে।

বিরাট কমপাউন্ডের মাঝখানে প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি শিবশঙ্কর হালদারের। চোখ-ধাঁধানো আর্কিটেকচার। বাড়িটার চারপাশ ঘিরে অনেকখানি করে ফাঁকা জায়গা। সামনের দিকে ফুলের বাগান। ফাঁকে ফাঁকে নানা ধরনের অর্কিড। পেছনে ফলের বাগিচা। আম জাম জামরুল কাগজিলেবু পেয়ারা, ইত্যাদি। একপাশে লাইন দিয়ে সুপারি গাছ। আরেক পাশে গ্যারেজ। আগে এখানে শিবশঙ্করের সেকেলে পৈতৃক বাড়ি ছিল। সেটা ভেঙে বছরখানেক হল এই ঝকঝকে নতুন বাড়িটা তোলা হয়েছে। অ্যাডভোকেট হিসেবে তাঁর যে বিশাল পসার, বাড়িটার দিকে তাকালে লহমায় টের পাওয়া যায়।

এখানে আগে অনেকবার এসেছে সঞ্চারী। গেটেব কাছে মাঝবয়সী বিহারী দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল। সে তাকে চেনে। হেসে হাতজোড় করল, 'নমস্তে দিদিজি—'

প্রতি-নমস্কার করে সঞ্চারী বলল, 'তোমার সাহেব আছেন?'

'হাঁ। আপনি ওঁর কামরায় চলে যান।'

কামরা বলতে চেম্বার। সঞ্চারী জানে, সেটা একতলাতেই। গেট পেরিয়ে বাগানের মাঝখান দিয়ে যে নুড়ির পথটা গেছে সেটা দিয়ে সোজা মেইন বিল্ডিংয়ে চলে এল সে।

শিবশঙ্করের বাড়িতে প্রচুর লোকজন, চাকর বাকরও পাঁচ ছ'টি। চারদিক গমগম করছে।

বাড়িতে ঢুকলে ডান পাশে চওড়া প্যাসেজটা ধরে খানিকটা এগুলে শিবশঙ্করের চেম্বার। তিন দিকের দেওয়ালে সিলিং অব্দি বইয়ের র‍্যাকগুলো চামড়ায় বাঁধানো মোটা মোটা আইনের বইয়ে ঠাসা। মাঝখানে মস্ত গ্লাস-টপ সেক্রেটারিয়েট টেবল। সেটার ওপর স্তূপাকার ফাইল। গোটা চারেক ফোন, তা ছাড়া মোবাইল, টেবল ক্যালেন্ডার, পেনহোল্ডারে অনেকগুলো পেন। টেবলটার ওধারে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন শিবশঙ্কর। এধারে গদি মোড়া ক'টা ফাশনেবল চেয়ার। সেখানে তাঁর দু'জন জুনিয়রকে দেখা গেল।

ছুটির দিন হলেও ব্যস্ততার শেষ নেই শিবশঙ্করের। কোনও একটা কেস নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছিলেন।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সঞ্চারী। শিবশঙ্কররা এমন মগ্ন হয়ে আছেন যে দরজার দিকে কেউ তাকাচ্ছেন না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে নীচু গলায় সে ডাকল, 'হালদারসাহেব—'

শিবশঙ্কর হালদারের বয়স চৌষট্টি পঁয়ষট্টি। টকটকে গায়ের রং। মাঝারি হাইট। সারা শরীরে প্রচুর মেদ জমেছে। চিবুকের তলায় তিনটে চর্বির থাক। চওড়া কপাল। ছোট ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুল। চোখে পুরু লেন্সের বাই-ফোকাল চশমা। সমস্ত চেহারা ঘিরে প্রবল ব্যক্তিত্ব।

শিবশঙ্কর মুখ তুলে দরজার দিকে তাকান। মৃদু হেসে বলেন, 'ও, তুমি—এস—এস—'

প্রথম দিকে সঞ্চারীকে আপনি করে বলতেন তিনি। বয়সে অনেক বড়,

আপনি টাপনি বললে সঞ্চারী অস্বস্তি বোধ করত। সে-ই তাঁকে তুমি করে বলতে বলেছে।

সফল, রাশভারী হলেও মানুষটি খুবই ভদ্র। সঞ্চারী ঘরের ভেতর চলে আসে। শিবশঙ্কর তাঁর দুই জুনিয়রকে বললেন, 'রাহুল, তরুণ, তোমরা ওধারে গিয়ে একটু বোসো। আমি সঞ্চারীর সঙ্গে কথা বলে নিই—'

প্রকাণ্ড ঘরখানার ডান দিকে এবং বাঁ দিকে বসার মতো আরও অনেকগুলো চেয়ার টেয়ার রয়েছে। জুনিয়ররা ডান দিকে চলে গেল।

সঞ্চারীকে সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে শিবশঙ্কর বললেন, 'বোসো—'

সঞ্চারী বসতে বসতে বিব্রতভাবে বলে, 'আপনারা জরুরি কাজ করছিলেন। আমি আগে খবর দিয়ে না আসায়—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে শিবশঙ্কর বললেন, 'আমাদের কাজটা এক ঘণ্টা পরে হলেও চলবে। তুমি নিশ্চয়ই কোনও আর্জেন্ট ব্যাপারে এসেছ। আগে সেটা শোনা যাক—'

একটু চুপ করে থেকে সঞ্চারী বলল, 'হ্যাঁ, আমাকে একটা খুব জরুরি ব্যাপারেই আসতে হয়েছে।'

'তোমাদের অর্গানাইজেশনে নতুন কী প্রবলেম দেখা দিল?'

সঞ্চারী আজই তো প্রথম এখানে এল না। প্রত্যেক বারই 'আশ্বাস'-এর কোনও না কোনও সমস্যা নিয়ে শিবশঙ্করের কাছে তাকে আসতে হয়েছে। 'আশ্বাস'-এ যে মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া হয়, তাদের কারওকে কারওকে নিয়ে আইনঘটিত সমস্যা দেখা দেয়, কখনও বা সমস্যাটা আদালত অব্দি গড়ায়। শিবশঙ্কর সেসব সামলান। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ভেবেছেন 'আশ্বাস'-এর কোনও বাসিন্দাকে নিয়ে নতুন ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হয়েছে।

সঞ্চারী বলল, 'না, প্রবলেমটা 'আশ্বাস'-এর নয়, আমার নিজের। আমি একটা সংকটে পড়েছি।'

একটু অবাক হলেন শিবশঙ্কর। জিগ্যেস করলেন, 'কিসের সংকট?'

সঞ্চারী জানায়, প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়ি তার নামে বিপুল অর্থ ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছেন, সেই কারণে তার প্রাক্তন স্বামী কোর্টে প্রতারণার মামলা করেছে, ফলে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বলল, 'এই বিপদ থেকে আপনিই আমাকে রক্ষা করতে পারেন।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করে, সব জেনে নিলেন শিবশঙ্কর। তারপর ভরসা

দেবার সুরে বললেন, 'তোমার এক্স-হাজব্যান্ড কিস্‌সু করতে পারবে না। তোমার গায়ে যাতে এতটুকু আঁচড় না লাগে, সেটা আমি দেখব।' সঞ্চারীর প্রতি তাঁর অপার সহানুভূতি। মেয়েটার বিয়ে আদৌ সুখের হয় নি। একটা বদ, দুশ্চরিত্র স্বামীর হাতে পড়ে সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর যেখানে চাকরি পেল সেই কর্মস্থলেও হাজারটা সমস্যা। তারপর নতুন এই মামলা। শিবশঙ্কর বলতে লাগলেন, 'আমি তো আছি। এই নিয়ে কোনও টেনশন কোরো না। তোমার যা ডেইলি রুটিন সেই অনুযায়ী কাজ করে যাও।'

আস্তে মাথা নাড়ে সঞ্চারী, 'আচ্ছা—'

শিবশঙ্কর বলেন, 'তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি তোমার ফেভারে। একবার কেসের ডেট পড়ুক, জয়দীপকে সমন ধরিয়ে কোর্টে তুলে ওর ছাল চামড়া আমি খুলে নেব। দেখব ও কত বড় বজ্জাত। ওকে নাকের জলে চোখের জলে যদি না করতে পারি তো আমার নাম শিবশঙ্কর হালদার নয়—'

অমরনাথরা বলেছেন, ভয় নেই। অ্যাডভোকেট হালদারও একই আশ্বাস দিয়েছেন। তবু সঞ্চারী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারল না। জিগ্যেস করল, 'কোর্টে কেসটা উঠলে জানাজানি হয়ে যাবে তো?'

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড সঞ্চারীর দিকে তাকিয়ে থাকেন শিবশঙ্কর। সে কী ইঙ্গিত দিচ্ছে তা মোটামুটি আঁচ করে নিয়ে বললেন, 'তা তো যাবেই। খবরের কাগজের ল'কোর্ট রিপোর্টাররা এই ধরনের মামলার গন্ধ পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর একটু তরল করলেন, 'বুঝতেই পারছ, স্ক্যান্ডালের গরম মশলা মেশানো থাকলে রিডার গোগ্রাসে গেলে। কাগজের কাটতি বাড়ে।'

বুকের ভেতর ঝাঁকুনি লাগে সঞ্চারীর। শুকনো মুখে জিগ্যেস করে, 'আমার কেসটা তাহলে নিউজ পেপারে বেরুবে?'

শিবশঙ্কর হাসলেন। 'তা তো বেরুবেই। ডিভোর্সের পরও প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁদের প্রাক্তন বউমাকে এতগুলো টাকা দিয়েছেন, তাই নিয়ে মামলা শুরু হয়েছে, এমন একটা খবর কেউ হাতছাড়া করে?'

মামলার কারণে আদালতে দৌড়ঝাঁপ তো আছেই, খবরটা কাগজে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারও আর জানতে বাকি থাকবে না। তাদের আবাসনেরও সবাই জেনে যাবে। এই টাকাটার ব্যাপারে যে কোনও রকম ছলচাতুরি নেই তা খুব কম লোকই বুঝবে। বেশির ভাগই ধরে নেবে এর মধ্যে

প্রচুর গণ্ডগোল রয়েছে। সঞ্চারীর দিকে আঙুল তুলে বলাবলি করবে, হুঁ হুঁ বাবা, এই মেয়েটা ভালোমানুষির মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায় বটে, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, কিন্তু ঝুলি থেকে বেড়ালটা বেরিয়ে পড়ল তো। পেটের ভেতর ছুকরির হাজারটা প্যাঁচ, স্বামীটাকে কায়দা করে তালাক দিয়ে জোঁকের মতো শ্বশুর-শাশুড়ির গায়ে সেঁটে রইল, তারপর কায়দা করে অতগুলো টাকা হাতাল। এ চীজটি পুরো দু'নম্বরী।

নিজের এইসব আশঙ্কার কথা শিবশঙ্করকে জানাতে তিনি আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন।—'সম্ভব, খুবই সম্ভব। ম্যালিসাস, জেলাস লোকেরা এসব করতেই পারে। তা ছাড়া, এতে যাদের সিকি পয়সা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তারাও কেচ্ছার খোরাক পেয়ে নেচে উঠবে। কেচ্ছা ঘাঁটাঘাঁটি করতে বাঙালিদের বড়ই ফুর্তি। এ এক লক্ষ্মীছাড়া জাত।' একটু থেমে ফের বলেন, 'আসলে কী জানো মা, তোমার নামে এতগুলো টাকা লিখে দেওয়া হয়েছে, এটা কেউ সহ্য করতে পারবে না।'

সঞ্চারী চুপ করে থাকে।

শিবশঙ্কর ফের বলেন, 'এত ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি তো কোনও অন্যায় কর নি। নিজে থেকে টাকাগুলো নিতে যাও নি, ফর্মার শ্বশুর-শাশুড়ি তোমাকে দিয়েছে। কুকুররা ঘেউ ঘেউ করবে, সেই জন্যে কি কেউ রাস্তায় বেরোয় না? কে কী বলল, কে কী লিখল, একদম গ্রাহ্য করবে না। টোটালি ইগনোর ইট।'

শিবশঙ্কর সঞ্চারীর ধসে-পড়া সাহস ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সে কোনও উত্তর দেয় না। ম্রিয়মাণ বসে থাকে।

শিবশঙ্কর থামেন নি, 'কেস যখন কোর্টে উঠেছে, ট্রুথ এস্টাব্লিশড হবেই। সত্যমেব জয়তে। ইউ আর আ ব্রেভ লেডি। 'আশ্বাস'-এর কত প্রবলেম সামলাও। এটাও কাটিয়ে উঠতে পারবে।'

শিবশঙ্কর তার মনোবল চাঙ্গা রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু সঞ্চারী কতটা সান্ত্বনা পেল, তার নিজের কাছেই তা পরিষ্কার নয়।

॥ আট ॥

টাকা এবং মামলার কথা দীপককেও ফোনে জানিয়েছে সঞ্চারী। কথায় কথায় বুঝিয়ে দিয়েছে, দীপক এসময় কলকাতায় থাকলে সে অনেকখানি সাহস

পেত। আসলে তার চারপাশে ছোট বড় নানা যুদ্ধক্ষেত্র। অনবরত তাকে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে এবং হচ্ছে। আবার একটা নতুন ফ্রন্ট খুলে গেল। একা আর কত দিক সামলানো যায়?

সব শোনার পর দীপক বলেছে, 'লিগ্যাল ব্যাটল যখন শুরু হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তো লড়তেই হবে।'

সঞ্চারী বলেছে, 'হ্যাঁ। এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সঞ্চারী জিগ্যেস করেছে, 'তোমাদের সেই আত্মীয় কী ঠিক করলেন?'

'কার কথা বলছ?'

'ওই যে যিনি তোমাদের কোম্পানিতে রিসেন্টলি একটা টপ পোস্টে জয়েন করেছেন, কলকাতায় ট্রান্সফারের জন্যে তুমি যাঁকে ধরেছিলে। কী বলছেন তিনি?'

'কিছুই না। দু'তিন বার তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছি। কলকাতায় ফিরে আসার আর্জেন্সি কতখানি, ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।'

'তারপরও কোনও রি-অ্যাকশন হল না?'

'বললাম তো—না।'

সঞ্চারী খুবই চাপা ধরনের মেয়ে। তার স্বভাবে কাঙালপনা নেই। কিন্তু কী যে হয়ে গেছে সেদিন, ভেতরে ভেতরে অনেকখানি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বলেছে, 'আমার ভীষণ ভয় করছে। তুমি কি—' বাকিটা শেষ না করে সে থেমে গিয়েছিল।

দীপক জিগ্যেস করেছে, 'আমি কি?'

'আরেক বার তাঁকে যদি বল—'

'বার বার ঘ্যান ঘ্যান করলে তিনি বিরক্ত হবেন। ওয়েট করে থাকা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই।'

সঞ্চারী খুব আশা করেছিল, খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসতে পারবে দীপক। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই এখন অনিশ্চিত। খুবই দমে গেছে সে।

একদিন মামলা শুরু হয়ে গেল।

ডেটের পর ডেট নিতে লাগলেন জয়দীপের ল'ইয়ার। এটা ওদের একটা কূট চাল। সঞ্চারী চাকরি করে সেই খবরটা জয়দীপ পেয়ে গেছে। যতটা সম্ভব তারা

তাকে আদালতে ছুটিয়ে ছুটিয়ে নাজেহাল করতে চায়। তা ছাড়া, মামলার খরচও রয়েছে। এককেকটা শুনানির দিন পড়া মানে টাকার শ্রাদ্ধ। জয়দীপ জানে, অমরনাথরা সঞ্চারীর নামে যে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছেন সেই টাকা আগেভাগে ভাঙিয়ে সে নিশ্চয়ই কেস লড়বে না। তাকে চূড়ান্ত হয়রানি করা যাবে, এতেই হয়তো জয়দীপ খুশি।

এটা মানতেই হবে, সঞ্চারীর বড় ভরসা শিবশঙ্কর হালদার। স্ট্যাম্প কাগজ কেনা বা আদালতের ছোটখাটো খরচ বাদ দিলে নিজের ফী-টি কিছুই তিনি নেন নি। মানুষটা বেশির ভাগ উকিল টুকিলের মতো চশমখোর, চামার নন। তাঁর মধ্যে মায়া দয়া করুণা যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। বহু গরিবের কেস তিনি বিনা পয়সায় লড়েন। যা ন্যায়সঙ্গত মনে হয় তার জন্য যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ভাবেন না তাঁর আর্থিক কতটা লোকসান হল। এই যে 'আশ্বাস'-এর মেয়েদের জন্য মাঝে মাঝেই তাঁকে কোর্টে দাঁড়াতে হয়, এজন্য ক'টা পয়সাই বা নেন? বলেন, 'আমার টাকার অভাব নেই। দুঃখী মেয়েগুলোর জন্যে এটুকু যদি না করলাম, তা হলে মানুষ বলে নিজের পরিচয় দেব কী করে?'

সঞ্চারীর প্রতি তাঁর অপার সমবেদনা। তিনি তো তাকে নতুন দেখছেন না। দিনের পর দিন মেয়েটার ওপর কত ঝড়ই না বয়ে গেছে। এই কেসটা বাড়তি এক উৎপাত। তিনি বলেছেন, 'আমার টাকা-পয়সার জন্যে তুমি ভেবো না।'

মামলার খবর শুনে অমরনাথরা যেচে টাকা দিতে চেয়েছেন। সঞ্চারী নেয় নি। বলেছে, 'দরকার হলে নেব।'

পর পর কয়েক দিন শুনানির পর অমরনাথের অসুস্থতা হঠাৎ অনেকখানি বেড়ে যায়। এদিকে তিনি এবং প্রতিমা যে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে টাকা লিখে দিয়েছেন সেটা দেখাবার পরও জয়দীপের ল'ইয়ার সন্তুষ্ট নন। তিনি অর্থাৎ আনন্দমোহন চাকলাদার অমরনাথদের আদালতে হাজির করতে চান। বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে হলফনামা পড়ে বলতে হবে সত্যিই সত্যিই তাঁরা টাকাটা দিয়েছেন। তাঁদের পক্ষে কোর্টে আসা যে সম্ভব নয়, সেজন্য মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জমা দিয়েছেন শিবশঙ্কর। শুধু তাই না, এই কেসে তিনি জয়দীপকে বাঙ্গালোর টেনে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু কোর্টে দাঁড়ালে সে যে কত বড় বজ্জাত আর লম্পট সেটা জেরায় জেরায় নতুন করে প্রমাণ করে দেবেন তিনি। জয়দীপের জিভ বার করে ছাড়বেন। সেই ভয়ে বাঙ্গালোর থেকে সেও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাঠিয়েছে।

মামলাটা আপাতত এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এদিকে যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তা-ই ঘটেছে।

নানা কাগজের 'আইন আদালত' বিভাগে কেসের সবিস্তার প্রতিবেদন বেরুতে লাগল। প্রতিটি প্রতিবেদনের শিরোনাম প্রায় এক : প্রাক্তন শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রতারণা করে এক মহিলার বিরুদ্ধে বিপুল অঙ্কের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। শুধু খবরের কাগজেই না, দু-একটা বাংলা টিভি চ্যানেলেও সংবাদ-পাঠকরা খবরটা শুনিয়ে দিল।

আগে অল্প লোকই জানত। মিডিয়ায় প্রচারের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ জেনে গেল। সঞ্চারীদের হাউসিং কমপ্লেক্সের বাসিন্দাদের তার সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল। সবাই তাকে পছন্দ করত। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তার প্রতি সকলেরই ছিল অফুরান সহানুভূতি। কিন্তু কেসের খবরটা জানাজানি হবার পর আজকাল এখানকার মানুষজন তার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। দূর থেকে টুকরো টাকরা যে কটু মন্তব্য ছুড়ে দেয় তাতে তার কান লাল হয়ে ওঠে।

॥ নয় ॥

এরই মধ্যে একদিন সঞ্চারীদের পাশের ফ্ল্যাটের সুকুমার সান্যাল অনেক রাত্তিরে হাউসিং কমপ্লেক্সের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুকুমার তার বাবার বন্ধু, তাদের পরিবারের একজন সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী। বয়স পঁয়ষট্টি, ছেষট্টি। এতটা বয়স হয়েছে কিন্তু শরীরে মেদ জমে নি। পাতলা, ছিপছিপে চেহারা। মাঝারি হাইট। চুল ধবধবে সাদা। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মুখের দিকে এক লহমা তাকালেই টের পাওয়া যায় মানুষটি স্নেহপ্রবণ। সঞ্চারীর বাবার মৃত্যুর পর তিনি যতখানি পেরেছেন, তাদের আগলে আগলে রাখতে চেষ্টা করেছেন। খুব বড় একটা চাকরি করতেন না। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ছোটখাটো একজন অফিসার হয়ে রিটায়ার করেছেন। পেনশন তেমন একটা পান না। স্ত্রী এবং তিনি, এই দু'জনকে নিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত সংসার। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

রিটায়ারমেন্টের সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির যে টাকা পেয়েছিলেন তা পোস্ট অফিসে রেখেছেন। সেখান থেকে যে ইন্টারেস্ট পান তার সঙ্গে পেনসন মিলিয়ে মোটামুটি চলে যায়।

যতদিন সঞ্চারী বেকার ছিল তার একটা চাকরির জন্য কম চেষ্টা, কম ছোটাছুটি করেন নি সুকুমার। কিন্তু সামান্য একজন রিটায়ার্ড অফিসারের পক্ষে কিছুই করে ওঠা সম্ভব হয় নি। তবে যতটুকু পেরেছেন টাকাপয়সা দিয়ে গোপনে সঞ্চারীকে সাহায্য করেছেন।

অফিস থেকে ফিরে আসছিল সঞ্চারী। অটো থেকে নেমে আবাসনের বাইরে সুকুমারকে দেখে রীতিমতো অবাক সে। সন্ধের পর পারতপক্ষে তিনি বাড়ির বাইরে বেরোন না। জিগ্যেস করেছে, 'সুকুমারকাকা, এত রাত্তিরে আপনি এখানে!'

সুকুমার বলেছেন, 'তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

বিস্ময়টা লহমায় অনেকখানি বেড়ে গেছে। সঞ্চারী বলেছে, 'তা রাস্তায় কেন? আমাদের ফ্ল্যাটে গেলেই তো পারতেন। নইলে আপনাদের ওখানে ডাকলে চলে যেতাম।'

'অসুবিধা ছিল। তোদের ওখানে গেলে কি তোকে তোদের ফ্ল্যাট থেকে আমাদের ফ্ল্যাটে ডেকে আনলে তোর মা জানতে পারতেন। সেটা আমি চাই নি। আয় আমার সঙ্গে—'

সঞ্চারী কোনও প্রশ্ন করেনি। সুকুমারের পিছু পিছু তাদের ব্লকে চলে এসেছে। দোতলায় উঠতে উঠতে ল্যান্ডিংয়ের কাছে এসে হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়েছেন সুকুমার। নিজে কয়েক ধাপ ওপরে উঠে দেখে নিয়েছেন সঞ্চারীদের ফ্ল্যাটের দরজাটা কোনও কারণে খোলা আছে কিনা। খোলা থাকলে রত্নময়ীর চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। না, দরজাটা বন্ধ। নিশ্চিত হয়ে ফের সঞ্চারীকে ওপরে ওঠার জন্য ইশারা করেছেন।

সঞ্চারীদের মুখোমুখি ফ্ল্যাটটাই সুকুমারদের। ডোর বেল বাজাতেই তাঁর স্ত্রী নিরুপমা, যাকে সে কাকিমা বলে, দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

নিরুপমার বয়স ষাটের কাছাকাছি। শরীরে বয়সের কিছু ভার পড়লেও এখনও তিনি যথেষ্ট সুন্দরী। টকটকে রং। প্রচুর চুল, তার বেশির ভাগটাই এখনও কালো। পাতলা ফুরফুরে নাক, ছোট্ট কপালের মাঝখানে সিঁদুরের বড় টিপ। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। পরনে লাল-পাড় টাঙ্গাইল শাড়ি। হালকা রঙের জমি। মসৃণ গোল হাতে শাঁখা এবং দু'গাছা করে চুড়ি, গলায় লকেটওলা সোনার চেন। নাকে লাল পাথর বসানো নাকছাবি। তিনিও সঞ্চারীকে যথেষ্ট স্নেহ করেন।

সুকুমার সঞ্চারীকে নিয়ে ড্রইংরুমে বসিয়েছেন। নিজে তার মুখোমুখি বসেছেন। নিরুপমা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলেছেন, 'কী খাবি বল—'

সঞ্চারী বলেছে, 'এখন আমি কিচ্ছু খাব না। সারা গায়ে রাস্তার ধুলো ধোঁয়া লেগে আছে। গা ঘিন ঘিন করছে। আমাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে চান করে একেবারে রাতের খাবার খেয়ে নেব।'

'অন্তত একটু চা খা—'

'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। বোসো—'

অগত্যা বসতেই হয় নিরুপমাকে।

সঞ্চারী এবার সুকুমারের দিকে তাকায়।—'রাস্তা থেকে যখন ধরে এনেছেন, তখন নিশ্চয়ই জরুরি কোনও ব্যাপার আছে, তাই না?'

সুকুমার বলেছেন, 'আছে। বলছি, শোন। তোর এগেনস্টে টাকাপয়সা নিয়ে যে কেসটা শুরু হয়েছে, আমাদের কমপ্লেক্সে তাই নিয়ে খুব রি-অ্যাকশন হয়েছে।'

সঞ্চারী বলেছে, 'জানি। আমার কানেও নোংরা কমেন্ট এসেছে।'

'কাগজে নানারকম খবর বেরুচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলোও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এসব দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে তোর কাকিমা আর আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। সমস্ত কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি সবাইকে বলেছি সঞ্চারী লোভী নয়। তাকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি, তোমরাও দেখছ। ও আমাদেরই মেয়ে। শী ইজ অ্যান অনেস্ট গার্ল। তোমরা এভাবে স্ক্যান্ডাল ছড়িও না। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনছে না। আসল ব্যাপারটা আমাকে বলবি?'

'নিশ্চয়ই।' কোন পরিস্থিতিতে অমরনাথরা লক্ষ লক্ষ টাকা তাকে লিখে দিয়েছেন, সব জানিয়ে সঞ্চারী বলেছে, 'বিশ্বাস করুন কাকু, এর থেকে একটি পয়সাও আমি নেব না।'

সুকুমার বলেছেন, 'তুই আমাকে বাঁচালি। ছোটবেলা থেকে যে মেয়েকে ভালো, সৎ দেখে আসছি, হঠাৎ যদি তার সম্বন্ধে গোলমেলে খবর পাই, কী কষ্ট যে হয়! আমি তোর প্রত্যেকটা কথা বিশ্বাস করছি। সারাদিন যথেষ্ট ধকল গেছে। যা, চান করে খেয়ে শুয়ে পড়।' একটু থেমে বলেছেন, 'ফের ওরা তোর সম্বন্ধে কিছু বলুক, মুখের মতো জবাব দেব। কারওকে ছাড়ব না।'

সুকুমার এবং নিরুপমা তাকে যে কত ভালোবাসেন, তার দুর্নামে কত দুঃখ যে পান সেটা নতুন করে অনুভব করেছে সঞ্চারী। বিপদের দিনে দু'টি সহৃদয়

মানুষকে সে পাশে পেয়েছে। দু'চোখ শিরশির করতে থাকে তার। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় বলেছে, 'কাকু কাকিমা, যাচ্ছি।'

মামলা হওয়ায় রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েছেন রত্নময়ী। হাওয়া কোন দিকে বইছে সেটা বোঝার জন্য প্রায় রোজই খোঁজখবর নেন। সকালের দিকে সঞ্চারীর অফিসে যাবার তাড়া থাকে। তখন কথা বলার সময় পাওয়া যায় না। রাত্তিরে সে ফিরে এলে খাবার টেবলে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেন রত্নময়ী।—'কেসটা কিরকম মনে হচ্ছে?'

সঞ্চারী জিগ্যেস করে, 'কিরকম বলতে?'

'জিততে পারবি?'

'সেটা আগেভাগে কী করে বলব? আমি কি জ্যোতিষী যে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব?'

রত্নময়ী বলেন, 'তুই না হয় বলতে না পারলি, শিবশঙ্করবাবু তো পাকা উকিল। সারা জীবন কেস করে করে চুল পাকিয়ে ফেলল। তিনি নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করতে পারছেন।'

শিবশঙ্কর যে তাকে পুরোপুরি ভরসা দিয়েছেন, এই মামলায় তার জেতাটা যে শতকরা একশো ভাগ সুনিশ্চিত, সেটা আর মাকে জানায় না সঞ্চারী। জানালে রত্নময়ী নেচে উঠবেন। তিরিশ লাখ টাকা কি একটা দু'টো পয়সা! সে বলে, 'এ নিয়ে শিবশঙ্করবাবুকে আমি কিছু জিগ্যেস করি নি। উনিও নিজে থেকে কিছু বলেন নি।'

রত্নময়ী বলেন, 'কী অদ্ভুত মেয়ে রে তুই!'

'অদ্ভুত! তার মানে?'

'শিবশঙ্করবাবু না বলুন, মামলাটা তো তোর। কী ফল হবে জানতে চাইবি না?'

'উনি তা পছন্দ করেন না।'

'সে কী!'

'শিবশঙ্করবাবু বলেন, আমার হাতে যখন কেসটা তুলে দিয়েছ তখন এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। রায় যেদিন বেরুবে সেদিন জানতে পারবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন রত্নময়ী। তারপর বলেন, 'অমরনাথবাবুরা তো

আলাদাভাবে লিখে দিয়েছেন, টাকাটা তাঁরা সজ্ঞানে তোকে দিয়েছেন। কোর্টে সেই লেখাটা নিশ্চয়ই শিবশঙ্করবাবু দেখিয়েছেন?'

সঞ্চারী বলে, 'হ্যাঁ।'

'তাতেও যদি কাজ না হয়, যত কষ্টই হোক, ওঁরা আদালতে গিয়ে জজকে নিজেরাই সব তো বলবেন?'

'দরকার হলে হয়তো তাই করবেন।'

রত্নময়ীর চোখেমুখে আলোর ঝলক খেলে যায়। বলেন, 'কেসটা তুই যে জিতে যাবি, আমার তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। ও, কতগুলো টাকা! কত বছর ধরে কষ্ট করছি। ভগবান বোধহয় এতদিনে আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাতে চলেছেন।'

সঞ্চারী উত্তর দেয় না। রত্নময়ীর মনোভাবটা তার কাছে খুবই স্পষ্ট। মা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন, মামলা জিতলে সঞ্চারী বিশাল অর্থের মালিক হবে। ফলে তাঁদের সংসারের হাল রাতারাতি পালটে যাবে। কিন্তু তিনি তো জানেন না, ওই তিরিশ লাখের একটা সিকি পয়সাও ছোঁবে না সঞ্চারী। ব্যাঙ্কে যেমন পড়ে আছে তেমনি পড়ে থাকবে।

কিন্তু এসব কথা মাকে মুখ ফুটে বলা যায় না। বললে এত বড় স্বপ্নভঙ্গ তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। একেবারে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বেন।

রীতিমতো আইন মেনে অমরনাথরা কয়েক লাখ টাকা সঞ্চারীর নামে লিখে দিয়েছেন। কিন্তু মামলাটা শুরু হবার পর মিডিয়া যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতে মনে হয়, এর চেয়ে বড় ক্রাইম স্বাধীন ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নি। দু'চার দিন পর পরই এই নিয়ে তারা খুঁচিয়ে চলেছে। শেয়ার মার্কেটের এক দালাল কয়েক শো কোটি টাকা লোপাট করে দিয়েছে। স্ট্যাম্প জাল করে কয়েক হাজার কোটি সরিয়েছে আরেক জন ক্রিমিন্যাল। এক মন্ত্রীর ঘাড়ের ওপর পশুখাদ্যের পাঁচ শো কোটিরও বেশি টাকা লোপাট করার অভিযোগ, তবু বুক ফুলিয়ে রাজ্যপাট চালিয়ে যাচ্ছে বিপুল বিক্রমে। এ ধরনের মহাপুরুষদের সংখ্যা হাজারে হাজারে। কিন্তু মাত্র কয়েক লাখ টাকা, যা সঞ্চারী চুরিও করে নি বা ধোঁকা দিয়ে ঠকিয়েও নেয় নি, তবু মিডিয়া তাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

এর পেছনে কারা আছে, কারা টিভি চ্যানেল আর খবরের কাগজগুলোকে একটানা উসকানি দিচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। এরা জয়দীপদের আত্মীয়-

স্বজন। বিশেষ করে তারাপদ। সে-ই আসল খলনায়ক। ঈর্ষা যে মানুষকে কতটা নীচে নামাতে পারে এই লোকটা হল তার সবচেয়ে জঘন্য নমুনা। নিজে কোনও দিনই অমরনাথদের একটা কানাকড়িও পাবে না, কিন্তু অনাত্মীয় একটি মেয়ে, অমরনাথদের এক সময়ের ছেলের বউ, উড়ে এসে জুড়ে বসে এতগুলো টাকা পেয়ে যাবে (তারাপদদের তেমনটাই ধারণা), সেই হিংসেয় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। নিজেরা না পায় না-পাবে, কিন্তু অন্য কেউ পাবে, এটা একেবারেই সহ্য হচ্ছে না।

মিডিয়া অনবরত শেল তো হানছেই, সেই সঙ্গে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বেনামা চিঠি। প্রতিটি চিঠিতেই থাকছে—হারামজাদী, বেজন্মা, জুয়াচোর, বজ্জাত, ঠগ ইত্যাদি বাছা বাছা সব বিশেষণ।

সঞ্চারী একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। আড়াল থেকে মারণাস্ত্র ছুড়লে তা ঠেকাবার কৌশল তার জানা নেই। উৎকণ্ঠায় তার দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। মনে হয় কেউ যেন বায়ুশূন্য কোনও সুড়ঙ্গের ভেতর তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে সেটার মুখ আটকে দিয়েছে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে ছুটে গিয়েছিল শিবশঙ্করের কাছে। পাশের ফ্ল্যাটের সুকুমার জেঠুকেও চিঠির কথা জানিয়েছে। দু'জনেই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁরা বলেছেন, 'ইগনোর ইট। টেনশন নেবার দরকার নেই। গায়ের জ্বালায় এসব করছে। যেখানে কিছুই পাওয়ার আশা নেই, বেনামি চিঠি লেখার এত এনার্জি বেশিদিন থাকবে না।'

॥ দশ ॥

আজ অফিসে এসে আরেক সংকটের মধ্যে পড়ে গেল সঞ্চারী। ভেতরে ঢোকার মুখে চোখে পড়ল গেটের পাশে দু'-তিনটে অচেনা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এই ধরনের নতুন মডেলের ঝকঝকে গাড়িতে 'আশ্বাস'-এ আগে আর কারওকে আসতে দেখেনি সে।

লম্বা-চওড়া উর্দি-পরা দারোয়ান সঞ্চারীকে দেখে প্রায় দৌড়ে এল। প্রথম যেদিন সে 'আশ্বাস'-এ আসে, দারোয়ানের নাম জানত না। চাকরি নেবার পর জেনে গেছে—বজরঙ্গী পাণ্ডে। তার চোখেমুখে কেমন একটা উৎকণ্ঠার ছাপ। সঞ্চারীকে দেখে সে যেন খানিকটা ভরসা পেল। বলল, 'দিদিজি, আপনার

জন্যে পুরা অফিস প্রতীক্ষা করে আছে—' সে বেনারসের লোক। যেটুকু হিন্দি বলে তা পুরোপুরি শুদ্ধ। তাই 'প্রতীক্ষা' শব্দটা বলেছে।

নিজের মধ্যে একটা চাপা উদ্বেগ টের পায় সঞ্চারী। জিগ্যেস করে, 'কী হয়েছে পাণ্ডেজি?'

ঝাঁ-চকচকে গাড়িগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বজরঙ্গী চাপা গলায় বলল, 'মহেশ্বরবাবুরা এসেছেন।'

সঞ্চারী চমকে ওঠে। মহেশ্বর নস্কর এ-অঞ্চলের একজন নেতা এবং সমাজসেবী। বেশ কয়েক বার দূর থেকে তাঁকে দেখেছে সে। কখনও মিটিং-এ ভাষণ দিচ্ছেন, কখনও পদযাত্রায় বেরিয়েছেন, কখনও বা রক্তদান শিবির খুলে সব তদারক করছেন। সবসময় মুখে হাসি লেগে থাকে। অতি তুচ্ছ লোকের সঙ্গেও হাতজোড় করে কথা বলেন। এই অঞ্চলে জনরব, ভালোমানুষের চেহারাটা নাকি তাঁর মুখোশ। ভেতরে একটা চিতাবাঘ লুকনো আছে। তাঁর সম্বন্ধে নানা কেলেঙ্কারির খবর কানে এসেছে সঞ্চারীর। লোকটার সঙ্গে নাকি আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের যোগ আছে। এলাকার সব অ্যান্টি-সোশালের তিনি আশ্রয়দাতা। প্রোমোটারি ব্যবসার সঙ্গেও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। এখানকার কোনও বড় মাপের জমির কেনাবেচা তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

হঠাৎ দু'মুখো সাপের মতো এমন একটা লোকের নজর 'আশ্বাস'-এর ওপর শুধু পড়েইনি, নিজে এসে হাজিরও হয়েছে। কারণটা কী হতে পারে?

বজরঙ্গী বলল, 'মহেশ্বরবাবুরা বড়ীদিদির কামরায় বসে আছেন। বড়ীদিদি বলেছেন, আপনি অফিসে এলে যেন সিধা সেখানে চলে যান।'

বড়ীদিদি অর্থাৎ মালবিকা রুদ্র। 'আশ্বাস'-এর ডিরেক্টর। তিনি সর্বেসর্বা হলেও ইদানীং বেশ কিছুদিন ধরে নানা রোগে ভুগছেন। কিডনির সমস্যা, আর্থরাইটিস, রেটিনার গণ্ডগোল, ইত্যাদি। আগে বারো-চোদ্দ ঘণ্টা একটানা খাটতে পারতেন। প্রায় একার হাতে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। কিন্তু এখন আর পেরে ওঠেন না, কর্মক্ষমতা অনেকটাই কমে গেছে। অফিসে এসে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা অব্দি কাটিয়ে দেন ঠিকই, কিন্তু নড়াচড়া খুব একটা করতে পারেন না। নিজের কামরায় বসেই চিঠিপত্র লেখেন, দরকারী কাগজপত্রে সই করেন। কর্মীদের এটা-সেটা নির্দেশ দেন।

তবে মালবিকা ডিরেক্টর হলেও 'আশ্বাস'-এর সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম

থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের যাবতীয় পরিকল্পনা করতে হয় সঞ্চারীকে। তার হাতে অনেক দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন মালবিকা।

অফিস বিল্ডিংয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ল বেশ কিছু কর্মী এধারে-ওধারে থোকায় থোকায় দাঁড়িয়ে নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। সবার মধ্যেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি। সঞ্চারীকে দেখে তারা বলে, 'শুনেছেন তো দিদি, মহেশ্বর নস্কর এসেছে—'

'শুনেছি—'

সঞ্চারী দাঁড়ায় না, সোজা মালবিকা রুদ্রের কামরায় চলে আসে। টের পাচ্ছিল, তার নিজের মধ্যেও টেনশন শুরু হয়ে গেছে।

টেবলের ওধারে মালবিকা, এধারে মহেশ্বর নস্কর এবং তাঁর একজন সঙ্গী বসে আছে।

মহেশ্বরের বয়স ষাট পেরিয়েছে। মাঝারি হাইট, তামাটে রং, নিরেট স্বাস্থ্য। মাথায় কলপ-লাগানো কুচকুচে কালো চুল। পরনে দামি ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে পাম্প শু। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তাঁর সঙ্গীটির বয়স কম, চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। চৌকো ধরনের মুখ। পেটানো স্বাস্থ্য। ছ'ফিটের কাছাকাছি হাইট। পরনে ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট। জননেতাদের নাকি অঙ্গ-রক্ষক, মানে বডিগার্ড থাকে। তারা ওদের সর্বক্ষণের সহচর। এই লোকটা খুব সম্ভব তা-ই।

মালবিকা খুবই দৃঢ় স্বভাবের মহিলা। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব। তবু মনে হল, মহেশ্বর নস্কর আচমকা এসে পড়ায় তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না। রীতিমতো নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। সঞ্চারীকে দেখে বললেন, 'এস—এস—'

সঞ্চারী মালবিকার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়ে। মালবিকা মহেশ্বরকে দেখিয়ে জিগ্যেস করেন, 'ওঁকে চেনো?'

সঞ্চারী বলল, 'উনি বিখ্যাত পলিটিক্যাল লিডার। চিনব না?'

বিনীত ভঙ্গিতে মহেশ্বর বলেন, 'বিখ্যাত-টিখ্যাত নই, আমি একজন খুব সামান্য জনসেবক।'

এবার সঞ্চারীর সঙ্গে মহেশ্বরের আলাপ করিয়ে দিলেন মালবিকা। বললেন, 'আমি ডিরেক্টর হলেও সঞ্চারীই এই অর্গানাইজেশনের সব কিছু।—সঞ্চারী, মহেশ্বরবাবু একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। তুমি আগে শুনে নাও—'

মহেশ্বর সরাসরি তাঁর প্রস্তাবটি পেশ করলেন না। প্রথমে কিছুক্ষণ ধানাইপানাই

করে কাটালেন। 'আশ্বাস'-এর কাজকর্ম, তার আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সঞ্চারীরা বিশাল সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে, তাদের কাজের তুলনা হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

লম্বা ভূমিকা শেষ হবার পর হাতজোড় করে মহেশ্বর বলতে লাগলেন, 'আপনাদের এই মহান কাজে আমিও একটু যুক্ত হতে চাই।'

সঞ্চারী সতর্ক হয়ে যায়। 'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'পরিষ্কার করে বলছি—'

মহেশ্বর এবার তাঁর ঝাঁপির মুখটি খুললেন। তার ভেতর থেকে যা বেরিয়ে এল তা এইরকম। তিনিও সামান্য সমাজসেবা করে থাকেন, অবশ্য 'আশ্বাস'-এর তুলনায় তা খুবই নগণ্য। রক্তদান শিবির, বস্ত্রদান শিবির—এই সব। এবার ঠিক করেছেন, 'আশ্বাস'-এর নির্যাতিত মেয়েদের জন্য এমন কিছু একটা করবেন যাতে সসম্মানে তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এখন সমস্ত কিছুই দুই দিদি অর্থাৎ মালবিকা এবং সঞ্চারীর রাজি হবার ওপর নির্ভর করছে।

মালবিকা মহেশ্বরের চেয়ে দু'-চার বছরের বড়ই হবেন। তাঁকে দিদি বলাই যায়। কিন্তু আধাআধি বয়সের সঞ্চারী কিভাবে লোকটার দিদি হল তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নয়। তার স্নায়ুগুলো টানটান হয়ে গিয়েছিল। জিগ্যেস করে, 'এখানকার মেয়েদের সামাজিক সম্মানের জন্যে কী ভেবেছেন?'

'আমরা কুড়িজন পাত্র পেয়েছি। তারা উদার, কোনও রকম সংস্কার নেই। সব জেনেশুনেই ওরা 'আশ্বাস'-এর মেয়েদের বিয়ে করতে চায়। রীতিমতো অনুষ্ঠান করে আমরা গণবিবাহের ব্যবস্থা করব। যে মর্যাদা মেয়েরা হারিয়েছে সেটা ফিরে পাবে। আপনাদের অনুমতি পেলে তাড়াতাড়ি সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলতে পারি।' বলে, একটু থেমে, ফের শুরু করেন, 'প্রথমে কুড়িজনকে দিয়ে আরম্ভ করছি। পরে আরও পাত্র জোগাড় করে যত জনকে পারি বিয়ে দেব।'

শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল সঞ্চারীর। এরকম গণবিবাহের খবর কাগজে অনেকবার পড়েছে সে। তবে সেসব ধর্ষিতাদের বিয়ে নয়, গরিব মা-বাবার মেয়েদের বিয়ে। ধর্ষিত যুবতীদের জীবনসঙ্গী করার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে মহান যুবকেরা যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবা যায়নি।

গণবিবাহের ফলে অনেকেরই ভালো হয়েছে। আবার বহু যুবতী নানাভাবে বিপদেও পড়েছে। এমন কথাও শোনা যায়, বেশ কিছু মেয়েকে বিক্রি করে অন্য রাজ্যে পাচার করা হয়েছে।

মহেশ্বরের উদ্দেশ্যটা ভালো। সঞ্চারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ করতে লাগল। লোকটার মুখে নিষ্পাপ ভালোমানুষি ছাড়া আব কিছুই নেই। কী মসৃণ, কী পবিত্র। তার আড়ালে অন্য কোনও মুখ আছে কিনা, এখন বোঝাই যাচ্ছে না।

সঞ্চারী একটু চিন্তা করে বলল, 'আপনি যা বললেন, খুবই ভালো কথা। এটা হলে মেয়েগুলো বাকি জীবন সুখেই থাকবে। কিন্তু—'

মহেশ্বর উৎসুক চোখে তাকান।—'কিন্তু কী?'

'এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাদের একটু ভাবতে দিন।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কবে আপনাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব?'

পরোপকারের এমন প্রচণ্ড আগ্রহ আগে আর কখনও কারও মধ্যে দেখেনি সঞ্চারী। বলল, 'সপ্তাহ তিনেক বাদে করুন।'

'নমস্কার। ঠিক তিন সপ্তাহ বাদে আমরা ফোন করব।' মহেশ্বররা উঠে পড়েন।

সঞ্চারীরাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি-নমস্কার করে যতক্ষণ না মহেশ্বররা চলে যান, অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর ফের বসতে বসতে মালবিকা বলেন, 'ওঁদের প্রোপোজালটা চমৎকার, তবু কোথায় যেন একটা খটকা থেকে যাচ্ছে।'

সঞ্চারীও সায় দেয়।

'ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর করা দরকার।'

'হ্যাঁ। তোমাকেই কিন্তু এই কাজটা করতে হবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সঞ্চারী জিগ্যেস করল, 'খোঁজ টোঁজ যে করব, সেটা কিভাবে? সকালের দিকে অফিসে আসি। সারা দিন কাটিয়ে রাত্তিরে বাড়ি ফিরে যাই। আমি তো এখানকার কারওকেই তেমন চিনি না। মহেশ্বর নস্কর সম্বন্ধে কাকে গিয়ে জিগ্যেস করব?'

'সেটা অবশ্য ঠিকই। এই এলাকার বেশির ভাগ মানুষই লোকটাকে ভয় পায়। তার মাস-ম্যারেজের পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী, ঝামেলার ভয়ে মুখ ফুটে কেউ বলবে বলে মনে হয় না। যারা এই এলাকার প্রতিটি বাসিন্দার নাড়িনক্ষত্রের খবর জানে, সেই পুলিশই একমাত্র হদিস দিতে পারে।'

'না না, মালবিকাদি—' সঞ্চারী প্রায় চমকে ওঠার ভঙ্গিতে বলে ওঠে।

মালবিকা অবাক হলেন।—'কী হল?'

'প্রথমেই পুলিশের কাছে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'এ কথা বলছ কেন?'

সঞ্চারী বলল, 'আপনি তো জানেন আজকাল অলমোস্ট সব এলাকাতেই অ্যান্টি-সোশাল, পলিটিশিয়ান আর পুলিশের মধ্যে আন-হোলি নেক্সাস তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা অশুভ চক্র। এখানকার পুলিশ অফিসাররা ঠিক কেমন, কতটা অনেস্ট, তাদের সঙ্গে মহেশ্বর নস্করের কী ধরনের হবনবিং, আমাদের জানা নেই। এখানে যদি ভালো অফিসার থাকে, কোনও সমস্যা নেই কিন্তু মহেশ্বর নস্করের সঙ্গে তাদের যদি গোপন আঁতাত থাকে, আমাদের সঙ্গে কথা বলার দশ মিনিটের ভেতর খবরটা নস্করের কাছে পৌঁছে যাবে।'

মালবিকাকে এবার রীতিমতো চিন্তিত দেখায়। তিনি বলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। এদিকটা ভেবে দেখিনি। আপাতত পুলিশকে বাঁদ দিয়ে অন্য কোনও সোর্স থেকে খবরটা নিতে হবে।'

সঞ্চারী জিগ্যেস করে, 'তেমন কোনও সোর্স কি আপনার জানা আছে?'

চোখ বুজে অনেকক্ষণ কী ভাবেন মালবিকা। তারপর সঞ্চারীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'একজনের কাছে গেলে সমস্ত কিছু জানা যেতে পারে।'

'কার কথা বলছেন?'

'জিতেন্দ্রনাথ দত্ত।'

'তিনি কে?'

মালবিকা জানালেন, জিতেন্দ্রনাথ ছিলেন কলকাতায় নাম-করা একটা কলেজের প্রিন্সিপাল। প্রায় কুড়ি বছর আগে রিটায়ার করেছেন। সৎ, সাহসী, আদর্শবাদী একজন শিক্ষক। ব্যক্তিজীবনে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা সামাজিক পরিবেশে কোনও রকম অন্যায়, অনাচার সহ্য করেন নি। কোথাও কারও বেচাল দেখলে প্রবলভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বয়স এখন আশি কি একাশি। দু'টো স্ট্রোক হয়ে গেছে। বাই-পাস সার্জারি করিয়েও তাঁকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা যায় নি। স্ত্রীর কয়েক বছর আগে মৃত্যু হয়েছে। ছেলেরা এবং পুত্রবধূরা তাঁকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না। বার্ধক্য, ব্যাধি, স্ত্রী-বিয়োগ—তাঁর ওপর দিয়ে ঝড়ঝাপটা কম যায় নি। কিন্তু এখনও আগের মতোই প্রচণ্ড মনের জোর। ভ্রষ্টাচারে দেশ যে ছেয়ে গেছে সে জন্য তিনি ক্ষিপ্ত। বাড়িতে বন্দি, তাই খবরের কাগজে অক্লান্তভাবে চিঠি লিখে তিনি প্রতিবাদ জানান।

মালবিকা আরও জানালেন, যখন তিনি 'আশ্বাস' প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন,

এই এলাকার লোকজন রে রে করে তেড়ে এসেছিল। তারা কিছুতেই এটা করতে দেবে না। ধর্ষিত মেয়েরা ভদ্রলোকদের পাড়ায় এসে আস্তানা গাড়লে পরিবেশ নোংরা হয়ে যাবে। সমস্ত অঞ্চল নরককুণ্ড হয়ে উঠবে। তাদের যুক্তি, যে সব মেয়ের ইজ্জৎ একবার গেছে তাদের মধ্যে লাজ-লজ্জা সঙ্কোচ শালীনতা, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। তারা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ওই অঞ্চলে যুবক তো কম নেই। মেয়েগুলো তাদের নষ্ট করে দেবে। জেনেশুনে এই সর্বনাশ ঘটতে দেওয়া যায় না।

মালবিকারা জমি কিনে যখন অফিস বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরু করেছেন, চারপাশের মানুষজন চড়াও হয়ে ভিত টিত ভেঙে দিয়েছে। মালবিকা দমেন নি, তাঁর মনের জোর প্রবল। নতুন করে ভিত গাঁথার ব্যবস্থা করেছেন। ফের তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। একবার দু'বার নয়, বার বার। তখন সারাক্ষণ এখানে উত্তেজনা, চিৎকার। সেই সঙ্গে স্লোগান।

'ভদ্রপাড়ায় নোংরা মেয়েমানুষদের কলোনি বানানো—'

'চলবে না, চলবে না।'

'এলাকার পবিত্রতা নষ্ট করা—'

'চলবে না, চলবে না।'

'মালবিকা রুদ্র—'

'দূর হটো, দূর হটো—'

ক্রুদ্ধ জনতা শুধু হই চই করে নি, মালবিকাদের জমির সামনে তেরপল খাটিয়ে ধরনায় বসেছিল। ধর্ষিত মেয়েদের স্পর্শ থেকে এলাকাকে তারা মুক্ত রাখবেই। এখানকার শুচিতা ধ্বংস হোক, কোনওমতেই তা বরদাস্ত করা হবে না।

মালবিকা ক্ষিপ্ত বাসিন্দাদের বোঝাতে চেয়েছেন, যাদের জন্য হোম বসাতে চাইছেন তারা অত্যন্ত দুঃখী, তাদের জীবনে যে বিপর্যয় ঘটে গেছে সেজন্য তারা আদৌ দায়ী নয়। সকলের সহানুভূতি এবং করুণাই ওদের প্রাপ্য। অঞ্চলের মানুষ দয়া করে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করুন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের অফিস এবং হোম হবে অনেক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ডের ভেতর। মেয়েরা হোমেই থাকবে, তাদের বাইরে বেরুতে দেওয়া হবে না, এবং বাইরের কেউ অনুমতি ছাড়া ভেতরে ঢুকতে পারবে না। তিনি কথা দিচ্ছেন তাঁদের জন্য এলাকার পবিত্রতা নষ্ট হবে না, শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে না।

কিন্তু মালবিকার কথায় কেউ কর্ণপাত করে নি। মালবিকা ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর টাকা তুলে জমিটা কিনেছেন। তাঁরও জেদ এখানেই হোমটা বসাবেন। পরিস্থিতি যখন এইরকম একটা চরম সংঘাতের দিকে এগুচ্ছে সেই সময় জিতেন্দ্রনাথ দত্ত একদিন ধরনা মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সেটা দশ বারো বছর আগের ঘটনা। তখনও জিতেন্দ্রনাথের স্ট্রোক হয় নি, স্ত্রী মারা যান নি, ঘরে বন্দিদশায় তাঁকে দিন কাটাতে হচ্ছিল না। শিরদাঁড়া টান টান করে হাঁটতেন। কণ্ঠস্বর ছিল সতেজ। তাঁকে ঘিরে তখন প্রবল এক ব্যক্তিত্ব।

জিতেন্দ্রনাথ এই অঞ্চলের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষ। যারা ধরনা দিচ্ছিল তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। কেউ একজন ব্যস্তভাবে কোত্থেকে একটা চেয়ার জুটিয়ে এনে তাঁকে বসতে দিয়েছিল। জিতেন্দ্রনাথ জিগ্যেস করেছিলেন, 'কী ব্যাপার বল তো, ক'দিন ধরে কানে আসছে তোমরা এখানে পিকেটিং শুরু করেছ। কারণটা কী?'

যারা পাড়ার শুচিতা রক্ষার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই শুরু করেছিল তাদের সেনাপতি মেঘনাদ চট্টরাজ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। তামাটে রং। লম্বাটে মুখ। দৃঢ় চোয়াল। মজবুত চেহারা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। একটা নাম-করা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির অ্যাকাউন্টস অফিসার। ধর্ষিত মেয়েরা যাতে এই তল্লাটে ঘেঁষতে না পারে, সেজন্য অফিস থেকে কয়েকদিন ছুটি নিয়েছেন। লোকটার মধ্যে সেকেলে কট্টর পিউরিটান কোনও আত্মা আস্তানা গেড়েছিল। তিনি জিতেন্দ্রনাথের কাছে এসে বিনীতভাবে কারণটা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

মালবিকা পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে সেটা বোঝার জন্য রোজ এখানে আসতেন। তখন গরম কাল। নিজের জমিতে একটা ছাতা মাথায় দিয়ে বসে মেঘনাদদের গতিবিধি লক্ষ করতেন। তাঁর মধ্যেও অদম্য এক জেদ ছিল। শেষ না দেখে তিনি ছাড়বেন না।

জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মালবিকার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মেঘনাদ, 'ওই ভদ্রমহিলা নাটের গুরু। উনি এখানকার আবহাওয়া পলিউট করতে চাইছেন।'

জিতেন্রনাথ কয়েক লহমা মালবিকাকে লক্ষ করে কী ভেবে ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে পড়েছিলেন। তারপর পায়ে পায়ে তাঁর কাছে চলে এসেছেন। মেঘনাদরা অবশ্য সঙ্গে আসেন নি, দূরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছেন।

ঋজু, অসীম ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অভিজাত চেহারার মানুষটিকে দেখে নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মালবিকা। জিতেন্দ্রনাথ নিজের পরিচয় দিয়ে জিগ্যেস করেছিলেন, 'কী নাম তোমার?'

তখন মালবিকার বয়স তিপ্পান্ন। প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা পেরুতে চলেছেন। অপরিচিত একটি মানুষ, তাঁর বয়স যতই হোক না, শুরুতেই তুমি করে বলবেন, এটা ভাবা যায় না। কিন্তু মালবিকার মনে হয়েছিল, এই মানুষটি আপনি টাপনি করে বললেই যেন অস্বাভাবিক লাগত। তিনি নিজের নাম জানিয়েছিলেন।

'কোথায় থাকো?'

'আমহার্স্ট স্ট্রিটে, সিটি কলেজের কাছে আমাদের বাড়ি।'

'বাড়িতে কে কে আছেন?'

'আমি আর কাজের লোক ছাড়া অন্য কেউ নেই। মা অনেকদিন আগে মারা গেছেন। কয়েক মাস হল বাবারও মৃত্যু হয়েছে।'

কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকেছেন জিতেন্দ্রনাথ। তারপর বলেছেন, 'মা-বাবার কথা বলছ কিন্তু তোমার নিজস্ব সংসার সম্বন্ধে তো কিছু জানালে না।'

মালবিকা জিগ্যেস করেছেন, 'নিজস্ব সংসার বলতে?'

'তোমার স্বামী, ছেলেমেয়ে—এই সব।'

'আমি আন-ম্যারেড।'

'তোমার বাবা কী করতেন?'

'তিনি একটা স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন।'

একটু চুপ করে থাকার পর জিতেন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছেন, 'তুমি কোনও কাজকর্ম কর—মানে চাকরি বাকরি?'

মালবিকা বলেছেন, 'একটা কলেজে পড়াতাম। কাজ ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'ডেজার্টেড, রেপ ভিকটিম মেয়েদের সোসাইটিতে কেউ শেলটার দেয় না। আমি তাদের জন্যে কিছু করতে চাই। তাই কলেজের চাকরি ছেড়েছি। দু'টো কাজ একসঙ্গে করা যায় না।'

মালবিকার কথাগুলো নাড়া দিয়ে গিয়েছিল জিতেন্দ্রনাথকে। তাঁর মুখ দেখে

তাই মনে হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'তোমার পরিকল্পনার কথা ডিটেলে বলতে আপত্তি আছে?'

'একেবারেই না। কিন্তু—' রাস্তার ওধারে মেঘনাদদের দেখিয়ে মালবিকা বলেছেন, 'ক'দিন ধরে ওরা আমাকে সমানে উত্যক্ত করছে। একটু পরেই হয়তো স্লোগান শুরু করে দেবে। এই পরিস্থিতিতে বলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া খানিকটা সময়ও লাগবে।'

'তা লাগুক, আমি শুনতে চাই—' জিতেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ঠিকই বলেছ, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। তুমি আমার সঙ্গে এস—'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়িতে। হেঁটে গেলে মিনিট সাত আটেক লাগবে।'

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিলেন মালবিকা। জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে কিনা, বুঝতে পারছিলেন না। পরক্ষণে মনে হয়েছিল, এই মানুষটির সঙ্গে গেলে কিছু একটা সুরাহা হতেও পারে। বলেছিলেন, 'চলুন—'

জিতেন্দ্রনাথদের বাড়িটা তেতলা। বেশ লোকজন চোখে পড়ছিল। কিন্তু কোনও রকম হইচই নেই। অনেকেই কথা বলছিল কিন্তু কেউ উঁচু গলায় নয়। বাড়ির পরিবেশটা ভারি শান্ত।

মালবিকাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠতে উঠতে জিতেন্দ্রনাথ একটি মাঝবয়সী কাজের লোককে বলেছিলেন, 'রাখাল, আমার ঘরে চা দিয়ে যাস।'

তেতলায় বিশাল একটা হল-ঘরে চলে এসেছিলেন তাঁরা। সারা ঘরের চারদিকের দেওয়ালে মেঝে থেকে সিলিং অব্দি উঁচু উঁচু আলমারিগুলো অজস্র বইয়ে ঠাসা। মাঝখানে মেহগনি কাঠের ভারী ধরনের সেকেলে খাট। আরেক দিকে সোফা, সেন্টার টেবল। একপাশের দেওয়াল ঘেঁষে মস্ত পড়ার টেবলে স্তূপাকার কাগজপত্র, ফাইল এবং টেলিফোন। বোঝাই যাচ্ছিল এটাই একসঙ্গে তাঁর লাইব্রেরি, বেডরুম এবং ড্রইং রুম।

মালবিকাকে বসিয়ে তাঁর মুখোমুখি একটা সোফায় বসেছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, 'এবার শুরু কর—'

মালবিকা জানিয়েছিলেন, কলকাতায় থাকলেও তাঁদের আদি বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটু খুব নগণ্য গ্রামে। তাঁর বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, প্রতিটি উইক-এন্ডে সেখানে যাওয়া হত। শনিবার গিয়ে সোমবার তাঁরা ফিরে

আসতেন। একবার সেখানে গিয়ে জানা গেল এক চাষী পরিবারের মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে। গ্রামের লোকজন লাঞ্ছিত মেয়েটির পরিবারকে মেয়েসুদ্ধ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলে। মেয়েটির বাবা সবার হাতে পায়ে ধরতে থাকে। অন্য কোথাও গেলে তারা থাকবে কোথায়? কী খাবে? বিনা অপরাধে এতবড় শাস্তি যেন তাদের না দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ তাদের কাকুতি মিনতিতে সাড়া দেয় নি। তাদের ওপর মানসিক চাপ এবং পীড়ন চলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে মেয়েটি আত্মহত্যা করে। মেয়েটি যখন চরম পথ বেছে নেয় সেই সপ্তাহে মালবিকারা গ্রামে যেতে পারেন নি। গেলে তাকে হয়তো বাঁচানো যেত।

পরের সপ্তাহে গিয়ে ঘটনাটা শোনার পর একেবারে ভেঙে পড়েন তাঁর বাবা জ্যোতির্ময় রুদ্র। ওই কৃষক পরিবারটি তাঁদের জমি চাষ করত। তাঁরা গ্রামে গেলে মেয়েটি অর্থাৎ জবা ছুটে আসত। হাসিখুশি, সরল, নিষ্পাপ এক যুবতী। সারাক্ষণ কলকল করে কথা বলত, আর কলকলানির সঙ্গে অবিরল হাসি। জ্যোতির্ময় তাকে খুব পছন্দ করতেন। জবার এমন শোচনীয় মৃত্যু তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। দু'দিন কারও সঙ্গে কথা বলেন নি। কলকাতায় ফিরে আসার পরও স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না। স্কুলে যেতেন না। বেশির ভাগ সময় একটা ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। আর আক্ষেপের সুরে খালি বলতেন, 'এভাবে জবাটা মরে গেল! ভাবা যায়! ওর জীবনে একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গিয়েছিল যে জন্যে তার নিজের কোনও দোষ নেই। কিন্তু সোসাইটি কী নিষ্ঠুর, মেয়েটাকে বাঁচতে দিল না, একরকম খুনই করে ফেলল।'

অস্থিরতা বা কষ্ট চিরস্থায়ী হয় না। জাগতিক নিয়মেই তার তীব্রতা কমে আসে। ফের পুরনো রুটিনে ফিরে এসেছিলেন জ্যোতির্ময় কিন্তু জবাকে এক লহমার জন্য ভুলতে পারছিলেন না। মেয়েটা সারাক্ষণ তাঁকে ভেতরে ভেতরে ঝাঁকি দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি মেয়েকে বলতেন, 'জানিস বুবু, জবার মৃত্যুটা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে সোসাইটির একটা অন্ধকার দিককে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। এই ধরনের মেয়েদের জন্যে কিছু একটা করা দরকার।'

মালবিকা জিগ্যেস করেছিলেন, 'কী করতে চাও?'

'কোনও হোম টোম করে এদের শেলটার দিয়ে যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা কর। তুই কী বলিস?'

জ্যোতির্ময় ছিলেন মালবিকার আইডল। তাঁর প্রতিটি কাজে, প্রতিটি কথায়

ছিল তাঁর নিঃশর্ত সায়। খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।—'এটা করতে পারলে বড় একটা কাজ হয়। এ ব্যাপারে আমার ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট সাপোর্ট আছে।'

জ্যোতির্ময় খুশি হয়েছিলেন।—'তোকেও কিন্তু এই কাজে আমার সঙ্গে হাত লাগাতে হবে।'

'তা তো লাগাতেই হবে।'

হোমের জন্য তোড়জোড় শুরু করেছিলেন জ্যোতির্ময়। কিন্তু নিজে তা করে যেতে পারেন নি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মালবিকার মনে হয়েছিল, বাবার সামাজিক দায়িত্ব পালনের উত্তরাধিকারটা তাঁর ওপর এসে পড়েছে। হোমটা তাঁকে করতেই হবে।

জ্যোতির্ময় প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি হিসেবে বেশ ভালো টাকাই পেয়েছিলেন। তা ছাড়া মালবিকার ঠাকুরদাও প্রচুর টাকা রেখে গেছেন। সেই টাকার মোটা একটা অংশ দিয়ে রথতলার জমিটা কিনে ফেলেছেন তিনি।

কলেজে চাকরি করে এত বড় একটা কাজে নামা যায় না। তিনি একা মানুষ। অবশ্য রান্নাবান্না, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদির জন্য দু'টো সব সময়ের লোক আছে। চব্বিশ বছর কলেজে চাকরি করে যা জমেছে আর জমিটা কেনার পরও বাবা এবং ঠাকুরদার যে টাকাটা ব্যাঙ্কে রয়ে গেছে তার ইন্টারেস্টে তাঁদের ভালোই চলে যাবে। তিনি কলেজে রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিলেন। সেটা পেয়ে প্রিন্সিপ্যাল আর অন্য কলিগরা বাড়িতে ছুটে এসেছিলেন। সবাই বুঝিয়েছেন, মালবিকা এমন পাগলামি যেন না করেন। অধ্যাপিকা হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম। ভালো করে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে মানুষের মতো মানুষ গড়াও একটা বিরাট সামাজিক কর্তব্য। যুক্তি হিসেবে মোটামুটি ঠিকই আছে। কিন্তু পৃথিবীর সবাই কি ছাঁচে তৈরি হয়? বেশির ভাগই ধরাবাঁধা, ঝুঁকিহীন, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটিয়ে দিতে পছন্দ করে। কমপিটিটিভ পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে কিংবা একে তাকে ধরে একটা চাকরি জুটিয়ে নিলাম। তারপর সেটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে বাকি জীবন তেলতেলে মসৃণভাবে কাটিয়ে দিলাম। যতদিন চাকরি ততদিন মাইনে, পার্কস, বোনাস। রিটায়ারমেন্টের পর প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, পেনশন। নিশ্চিন্ত, নিটোল দিনযাপন। কিন্তু এমনও কেউ কেউ আছে যাদের মাথায় জেদ আর আদর্শবাদের পোকা কুটুস কুটুস কামড় দেয়। তারা ছক-কাটা রাস্তায় চলতে চায় না। মালবিকা তাদেরই একজন।

প্রিন্সিপ্যাল আর কলিগদের অনুরোধ, চাপ কোনও কিছুই মালবিকাকে টলাতে পারে নি। কলেজের চাকরিটা তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু রথতলায় জমিটা কিনে হোম বসাতে গিয়ে অবিরল বাধা আসতে লাগল।

সমস্ত জানিয়ে মালবিকা বলেছিলেন, 'কেন হোমটা করতে চাই, আশা করি বোঝাতে পেরেছি।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিলেন জিতেন্দ্রনাথ।—'হ্যাঁ। তোমার উদ্দেশ্যটা খুবই মহৎ। চিন্তা কোরো না। যেখানে জমি কিনেছ সেই জায়গাতেই হোম হবে।'

'কিন্তু মেঘনাদবাবুরা যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন তাতে—'

মালবিকাকে শেষ করতে দেন নি জিতেন্দ্রনাথ। তার আগেই হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছেন।—'ওদের দিকটা আমি দেখব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

জিতেন্দ্রনাথদের বাড়ির কাজের সেই লোকটা, যার নাম রাখাল, শুধু চা-ই না, সেই সঙ্গে বিস্কুট এবং সন্দেশও নিয়ে এসেছিল। খুব সম্ভব বাইরের কেউ এলে ও বাড়িতে খালি চা দেওয়াটা রেওয়াজ নয়। কাজের লোকদের নিশ্চয়ই বলা আছে, চায়ের সঙ্গে মিষ্টি টিষ্টিও যেন নিয়ে আসে।

যাই হোক, জিতেন্দ্রনাথ মেঘনাদ চট্টরাজদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধরনা, স্লোগান, পদযাত্রা বন্ধ করেছিলেন। এরপর বছরখানেকের মধ্যে হোম চালু হয়ে গেছে। হোমের নামকরণটা করে দিয়েছিলেন জিতেন্দ্রনাথই—'আশ্বাস'।

'আশ্বাস' চালাতে গিয়ে প্রথম প্রথম যখনই কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে, জিতেন্দ্রনাথ সব সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বেশ কিছু টাকা দিয়েও সাহায্য করেছেন। তাঁর অনুরোধে তাঁর বন্ধুরাও বেশ কিছু অর্থ দিয়েছেন। জিতেন্দ্রনাথকে না পেলে মালবিকার যত জেদ আর দৃঢ়তাই থাক না, হোম তৈরি করা এবং সেটা চালানো সহজ হত না।

যতদিন জিতেন্দ্রনাথ সুস্থ ছিলেন, চলে ফিরে বেড়াতে পারতেন, 'আশ্বাস'-এ প্রায় রোজই আসতেন। দু'তিন ঘণ্টা করে কাটিয়ে যেতেন। কিন্তু ক'বছর হল, শয্যাশায়ী হবার পর, তাঁর পক্ষে আর আসা সম্ভব হচ্ছে না।

জিতেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি জানিয়ে মালবিকা সঞ্চারীর দিকে তাকালেন।—'উনি যদি বেড-রিডন না হয়ে পড়তেন, মহেশ্বর নস্করকে নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকত না। যা ব্যবস্থা করার তিনিই করতেন। এখন আর তা সম্ভব নয়।

তবু ওঁর অ্যাডভাইসটা পেলে ভালো হত। কিন্তু কেউ ওঁর কাছে যাক বা ওঁকে ফোন করুক, তা ওঁর বাড়ির কেউ একেবারেই চায় না। তারা ভাবে, শয্যাশায়ী বৃদ্ধ মানুষটি আর ক'দিনই বা বাঁচবেন। তাঁর মাথায় উটকো, অবাঞ্ছিত ঝঞ্ঝাট ঢোকানো কোনওভাবেই ঠিক নয়।' একটু থেমে হতাশার সুরে বললেন, 'ওঁর সঙ্গে তো যোগাযোগ করা যাবে না। যদি—' শেষ না করে থেমে গেলেন।

উদ্গ্রীব শুনে যাচ্ছিল সঞ্চারী। বলল, 'জিতেন্দ্রনাথবাবুর ঠিকানাটা আমাকে দিন তো বড়দি—'

মালবিকা রীতিমতো অবাক হলেন।—'ওঁর ঠিকানা দিয়ে তুমি কী করবে?'

'ওঁর সঙ্গে দেখা করব।'

দ্বিধার সুরে মালবিকা বললেন, 'হুট করে চলে যাওয়া কি ঠিক হবে? ওঁর ছেলেরা দেখা করতে দেবে বলে মনে হয় না।'

সঞ্চারী বলল, 'চেষ্টা করে একবার দেখাই যাক না। প্রয়োজনটা তো আমাদের। কী আর হবে? না হয় ভেতরে ঢুকতে দেবে না। দরজা থেকেই ভাগিয়ে দেবে।'

মালবিকা মোটামুটি ধরেই নিয়েছেন, শুধু শুধু ছোটাছুটিই সার। জিতেন্দ্রনথের বাড়ি গিয়ে কাজ হবে না। নিরুৎসুক ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখ, কী করতে পার—

॥ এগারো ॥

মালবিকা ঠিকানা দিয়েছিলেন। দু'দিন পর সঞ্চারী জিতেন্দ্রনাথদের বাড়িতে চলে এল। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপতেই একটি বয়স্ক কাজের লোক সেটা খুলে জিগ্যেস করল, 'কাকে চাইছেন দিদি?'

সঞ্চারী বলল, 'আমি জিতেন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করব।'

লোকটা বেশ বিনয়ী। একটু বিব্রতভাবে বলল, 'আপনি বোধ হয় জানেন না, অনেকদিন ধরে উনি রোগে কষ্ট পাচ্চেন। ডাক্তার চান টান করার সময়টুকুন ছাড়া তাঁকে বিছানা থেকে নামতে মানা করেচেন। কারও সঙ্গে দেখা করাও বারণ।'

'শুনেছি। কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা না করলেই নয়। আমার ভীষণ দরকার।'

লোকটা কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই ভেতর থেকে কারও গলা ভেসে এল, 'কার সঙ্গে কথা বলছ রাখালদা?'

'একজন দিদিমণি—'

'কে?' বলতে বলতে যাঁকে দরজার কাছে চলে আসতে দেখা গেল তাঁর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে সরু সরু রুপোর তার। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। একটু ভারী ধরনের শরীর। ঘাড়ে, গলায়, চিবুকের তলায় মেদ জমতে শুরু করেছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে ঢোলা পাজামা-পাঞ্জাবি।

সঞ্চারীকে দেখে মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি রীতিমতো অবাকই হলেন। কয়েক লহমা তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর রাখাল যা জিগ্যেস করেছিল, তিনিও তাই করলেন।

সঞ্চারী একই উত্তর দিল।

মাঝবয়সীর কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল।—'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

সঞ্চারী বলল, 'চেনার কারণ নেই। আগে কখনও আমাদের দেখা হয় নি। নিজের পরিচয়টা দিচ্ছি। আমি সঞ্চারী, 'আশ্বাস'-এ কাজ করি।'

মাঝবয়সী নিজের পরিচয়ও দিলেন। নাম অরুণেশ দত্ত। তিনি জিতেন্দ্রনাথের ছেলে। বললেন, ' 'আশ্বাস' থেকে বেশ কয়েক বছর আগে মালবিকা রুদ্র প্রায়ই আসতেন।'

'মালবিকাদি তা বলেছেন। আমি রিসেন্টলি, এই বছর দুই হল, ওখানে জয়েন করেছি। মালবিকাদির মুখে স্যার, মানে আপনার বাবার কথা কত বার যে শুনেছি! উনি সাহায্য না করলে—'

সঞ্চারীকে থামিয়ে দিয়ে অরুণেশ বললেন, 'আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন?'

সঞ্চারী মুখটা করুণ করে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি সেটা স্যারকেই বলতে চাই।'

'বাবা কী অবস্থায় আছেন, আপনারা কি জানেন?'

'সব জানি। নিরুপায় না হলে ওঁকে কিছুতেই বিরক্ত করতাম না। দয়া করে 'না' বলবেন না।' বলে হাতজোড় করল সঞ্চারী।

অরুণেশ কী একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আসুন। কিন্তু দশ মিনিট সময় পাবেন। বেশি কথা বললে ওঁর খুব কষ্ট হয়।'

'অনেক ধন্যবাদ। দশ মিনিটই যথেষ্ট।'

অরুণেশের সঙ্গে তিন তলায় জিতেন্দ্রনাথের ঘরে চলে আসে সঞ্চারী। বিশাল কামরাটার মাঝখানে খাটে শুয়ে ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। ঘোলাটে নিষ্প্রভ চোখের তলায় কালির পোঁচ। গাল ভেতরে ঢুকে গেছে। চুল প্রায় নেই বললেই হয়। কণ্ঠার এবং হাত-পায়ের হাড়গুলো প্রকট। ঢলঢলে চামড়ার তলা থেকে শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মনে হয়, মানুষের শীর্ণ একটা কাঠামো পড়ে আছে বিছানায়।

জিতেন্দ্রনাথের শিয়রের কাছে একটা নীচু টেবলে রয়েছে নানা ধরনের ওষুধ। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল থেকে শুরু করে তরল ওষুধের অজস্র শিশি। ঘরের একধারে অক্সিজেনের সিলিন্ডার। বোঝাই যায়, হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হলে ওটা কাজে লাগানো হবে। এমার্জেন্সি ব্যবস্থা।

একটি নার্স জিতেন্দ্রনাথকে ওষুধ খাইয়ে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিল।

অরুণেশ তাঁর সঙ্গিনীকে দেখিয়ে বললেন, 'বাবা, ইনি সঞ্চারী দেবী। 'আশ্বাস' থেকে তোমাকে আলাদা করে কিছু বলতে এসেছেন। আমি আপত্তি করেছিলাম। উনি শোনেন নি। বললেন, ব্যাপারটা খুব জরুরি। আমি ওঁকে দশ মিনিট সময় দিয়েছি।'

মুখ মোছানো হয়ে গিয়েছিল। ক্ষীণ স্বরে জিতেন্দ্রনাথ নার্স এবং অরুণেশকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে সঞ্চারীকে বললেন, 'কোণের দিকে ক'টা চেয়ার আছে। একটা টেনে এনে আমার কাছে বোসো।'

চকিতের জন্য সঞ্চারীর মনে হল, 'আশ্বাস'-এর নাম শুনে জিতেন্দ্রনাথ উৎসুক হয়ে উঠেছেন। অরুণেশ আর নার্সটি ঘর ফাঁকা করে চলে গেল। আর চেয়ার এনে খাটের কাছে বসে পড়ল সঞ্চারী।

বালিশের পাশে চশমার খাপটা ছিল। সেটা খুলে রোগা হাতে চোখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ সঞ্চারীর দিকে তাকিয়ে থাকেন জিতেন্দ্রনাথ। তারপর বলেন, 'তুমি 'আশ্বাস'-এর সঙ্গে কিভাবে যুক্ত?'

বয়স হয়েছে, রোগজর্জর, কিন্তু মস্তিষ্কটি এখনও পুরোপুরি সতেজ। সঞ্চারী বুঝতে পারে, হুট করে কেউ এসে বলল, 'আশ্বাস' থেকে এসেছে, তক্ষুনি তা তিনি মেনে নেবেন, তেমন ভাবাটা একটু বাড়াবাড়িই। যাচাই না করে তিনি কোনও আলোচনাতেই যাবেন না।

সঞ্চারী জানায় সে ওখানকার ডেপুটি প্রোগ্রাম অফিসার এবং খুব বেশিদিন কাজ করছে না।

'আই সী। অনেকদিন কাজ করলে তোমার সঙ্গে আগেই আমার আলাপ হত। কেননা ওখানে আমার রেগুলার যাতায়াত ছিল।'

'শুনেছি স্যার।'

জিতেন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, 'আশ্বাস'-এ কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে। অ্যাম আই রাইট?'

সঞ্চারী আস্তে মাথা নাড়ে।—'হ্যাঁ স্যার। খুবই বড় রকমের প্রবলেম।'

সঞ্চারীর দিকে কাত হয়ে কথা বলছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। এবার বালিশে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন। জিগ্যেস করলেন, 'আগে কোনও সমস্যা হলে মালবিকা দৌড়ে আসত। এবার সে এল না কেন?'

'কিছুদিন ধরে দিদির শরীরটা ভীষণ খারাপ যাচ্ছে। তবু নিশ্চয়ই আসতেন। কিন্তু আপনি বেড-রিডন হয়ে আছেন। তাই এসে আপনাকে উতলা করতে চান নি। কিন্তু সমস্যাটা এমনই মারাত্মক যে দিদি বারণ করা সত্ত্বেও আমি জোর করেই চলে এসেছি।'

'ঠিক আছে, এখন বল কী হয়েছে।'

মহেশ্বর নস্করের ব্যাপারটা সবিস্তার জানিয়ে দিল সঞ্চারী।

জিতেন্দ্রনাথ বললেন, 'মহেশ্বর কি তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে?'

'একেবারেই না। হোমের মেয়েদের গণবিবাহে আমরা যাতে রাজি হই সেজন্যে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তিন উইক পর বিয়ের ব্যাপারে আমাদের মতামত জানালেই চলবে। কিন্তু—'

তার কথার মধ্যেই জিতেন্দ্রনাথ বলে ওঠেন, 'কিন্তু কী? তোমাদের মনে খটকা দেখা দিয়েছে, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ লাঞ্ছিত মেয়েদের জন্যে কেন তার প্রাণ কেঁদে উঠল, কেন মেয়েগুলোর বিয়ে দিয়ে সামাজিক মর্যাদা দিতে চায়, এসব কোটি টাকার প্রশ্ন। তিন উইক তো সময় দিয়েছিল, তার মধ্যে ক'দিন কেটে গেছে?'

'দু'দিন।'

জিতেন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন, 'হাতে এখনও উনিশ দিন সময় আছে।'

সঞ্চারী চুপ করে থাকে।

জিতেন্দ্রনাথ এবার বলেন, 'মহেশ্বর সম্পর্কে তোমাদের মনে সন্দেহ হচ্ছে কেন?'

সঞ্চারী একটু ভেবে বলল, 'ওঁর সম্বন্ধে নানা গোলমেলে খবর পাই। বাইরে থেকে মহেশ্বরবাবুকে দেখতে যেমন মনে হয়, ভেতরে ভেতরে তিনি নাকি ঠিক তার উলটো। কী করা উচিত বুঝতে না পেরে আপনার কাছে এসেছি।'

'খুব ভালো করেছ। দ্যাট ম্যান ইজ আ ডেভিল। এই গণবিবাহের পেছনে নিশ্চয়ই লোকটার কোনও মোটিভ আছে। তোমরা কিছুতেই রাজি হবে না।'

'রাজি না হলে ওঁরা যদি ঝামেলা করেন?'

দুর্বল কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব উঁচুতে তোলেন জিতেন্দ্রনাথ। 'আমি বিছানায় পড়ে আছি ঠিকই, কিন্তু এখনও মরে যাই নি। এই অঞ্চলের মানুষ আমাকে ভালোবাসে। সম্মান করে। আমি কিছু বললে যে কোনও ঝুঁকি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। পলিটিকস করে বলে মহেশ্বর নস্কর যা খুশি করে পার পেয়ে যাবে তা কোনও মতেই হতে দেব না।'

সঞ্চারী চমকে ওঠে। তার চোখেমুখে চমকের সঙ্গে শঙ্কাও ফুটে বেরোয়। সে বলে, 'স্যার, আপনার যা শারীরিক অবস্থা তাতে উত্তেজনা খুবই ক্ষতিকর। আমার মনে হয়, এসে ভুল করেছি।'

জিতেন্দ্রনাথ বললেন, 'কোনও ভুল করো নি। না এলেই বরং মারাত্মক ভুল হত। আর শোন, যদি মহেশ্বর এ নিয়ে ফের উত্যক্ত করে, আমাকে তক্ষুনি জানাবে। ও কত বড় সমাজসেবী আর নেতা হয়েছে, একবার দেখব।'

'কিন্তু—'

এই সময় অরুণেশ আর সেই নার্সটি ফিরে আসে। অরুণেশ সঞ্চারীকে বললেন, 'দশ মিনিট কিন্তু পার হয়ে গেছে। আমরা দরজার বাইরে বারান্দায় ছিলাম। বাবা অনেক কথা বলেছেন, মাঝে মাঝে উত্তেজিতও হয়ে উঠছিলেন। প্লিজ, এবার ওঁকে ছেড়ে দিন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—' সঞ্চারী ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়। তাঁকে ভীষণ বিব্রত দেখাচ্ছে।

অরুণেশ তাকে ছাড়তে বললে কী হবে? জিতেন্দ্রনাথ কিন্তু ছাড়লেন না। হাতের ইশারায় সঞ্চারীকে ফের বসতে বললেন। তারপর ছেলের দিকে তাকান। —'এই মেয়েটির নাম তুমি জানো। ওকে ভালো করে চিনে রাখো—'

অরুণেশের বয়স কম হয় নি। কিন্তু এই বয়সেও বৃদ্ধ রোগগ্রস্ত শয্যাশায়ী বাবাকে রীতিমতো ভয় পান। তিনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, বুঝতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন।

জিতেন্দ্রনাথ থামেন নি।—'সঞ্চারী 'আশ্বাস'-এর একটা কঠিন সমস্যা নিয়ে আমার কাছে এসেছে। আমার ধারণা, ওকে ফের আমার কাছে আসতে হবে। তখন ওকে বাধা দেবে না। মনে থাকবে?'

নীচু গলায় অরুণেশ উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আরেকটা কথা। কেউ যাতে ফোন করে আমার টেনশন না বাড়ায় কিংবা বিরক্ত না করে, এই ওজর তুলে ফোন সরিয়ে দিয়েছ। ফোনটা এখনই এনে লাগিয়ে দেবে, আর ওটার নাম্বার সঞ্চারীকে লিখে দিও।'

'দেব—' শুকনো গলায় বললেন অরুণেশ। ব্যাপারটা যে তাঁর পছন্দ হয়নি, মুখ দেখে আঁচ করা যায়।

জিতেন্দ্রনাথের চোখ এবার সঞ্চারীর দিকে চলে আসে। বললেন, 'যখনই দরকার হবে, ফোন কোরো। আর এ বাড়ির দরজা সব সময় তোমার আর মালবিকার জন্যে খোলা থাকবে। তেমন বুঝলে চলে আসবে।' ছেলেকে বললেন, 'ওকে রাস্তা অব্দি পৌঁছে দিয়ে এস।'

একটুকরো কাগজে এ বাড়ির ফোন নাম্বারটা লিখে, সঞ্চারীকে দিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে নিঃশব্দে নীচে নেমে এলেন অরুণেশ। চোখের কোণ দিয়ে দু-একবার অরুণেশকে লক্ষ করল সঞ্চারী। তাঁর মুখটা থমথমে। কারণটা খুবই স্পষ্ট। জিতেন্দ্রনাথের মস্তিষ্কে উটকো টেনশন ঢুকিয়ে দেবার জন্য তিনি খুশি হন নি। কোনও রকমে 'আচ্ছা চলি। নমস্কার—' বলে সে রাস্তায় নেমে পড়ে।

॥ বারো ॥

মহেশ্বর নস্করকে তিন সপ্তাহ সময় দিয়েছিল সঞ্চারীরা। জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে আসার পর একেকটা দিন কাটছে আর রক্তচাপ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে তাদের।

এর মধ্যে জিতেন্দ্রনাথ নিজে থেকে দু-একদিন পর পর ফোন করে খবর নিয়েছেন, মহেশ্বর নস্কর 'আশ্বাস'-এ আর হানা দিয়েছে কিনা।

সঞ্চারী এবং মালবিকা দু'জনেই বলেছেন, 'না, স্যার।'

বার বার জিতেন্দ্রনাথ সঞ্চারীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'ও যখনই আসুক বা ফোন করুক, কী বলে তক্ষুনি আমাকে জানাবে।'

'নিশ্চয়ই স্যার।'

তিন সপ্তাহের পর আরও চার পাঁচ দিন পেরিয়ে গেল কিন্তু না, মহেশ্বর নস্করের দিক থেকে কোনও রকম সাড়াশব্দ নেই। যে দুর্ভাবনা চাঁই চাঁই পাথরের মতো মাথার ওপর চেপে বসেছিল, সেটা সরে যাচ্ছে। সঞ্চারীদের ধারণা, মহেশ্বর নস্করের মতো ধুরন্ধর লোকেরা হাজার তালে ঘোরে। হয়তো গণবিবাহের চেয়ে অনেক বড় ধান্দার খোঁজ পেয়ে গেছে, আর তাই নিয়ে মেতে উঠেছে। সঞ্চারী এবং মালবিকা মাথা থেকে দুশ্চিন্তা নেমে যাওয়ায় অনেকখানি হালকা বোধ করছিলেন। কিন্তু সেটা যে কত ক্ষণস্থায়ী, টের পেতে বেশি সময় লাগল না।

আজ অন্য দিনের মতো কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় অফিসে এসেছিল সঞ্চারী। নানা জায়গায় অনেকগুলো জরুরি ই-মেল পাঠাবার ব্যাপার রয়েছে। কম্পিউটারে চোখ রেখে তাই করে যাচ্ছে সে।

হঠাৎ করে ডাকে চমকে ওঠে। 'দিদি—' কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে চোখ সরাতেই সঞ্চারী দেখতে পেল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পাপিয়া। সে 'আশ্বাস'-এর একজন কর্মী। তার মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

কাজে ব্যাঘাত হওয়ায় সঞ্চারী একটু বিরক্ত হল। বলল, 'কী হয়েছে?'

'সেই লোকটা আবার এসেছে। বড়দি আপনাকে ডাকছেন।'

কার কথা পাপিয়া বলছে, প্রথমটা বুঝতে পারল না সঞ্চারী। জিগ্যেস করল, 'কোন লোকটা?'

কাঁপা কাঁপা গলায় পাপিয়া বলল, 'মহেশ্বর নস্কর।' মহেশ্বর কী ধরনের মানুষ, কতটা বিপজ্জনক, এই 'আশ্বাস'-এর প্রতিটি কর্মী খুব ভালোই জানে।

এদিকে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে সঞ্চারী। কম্পিউটার বন্ধ করে রুদ্ধশ্বাসে প্রায় ছুটতে ছুটতে মালবিকা রুদ্রের কামরায় চলে আসে।

মহেশ্বর নস্কর তার অঙ্গরক্ষক সেদিনের সেই মজবুত চেহারার যুবকটিকে পাশে নিয়ে মালবিকার টেবলেব এধারে জাঁকিয়ে বসে আছেন। সঞ্চারীকে দেখে উঠে দাঁড়ান। তাঁর মুখ জুড়ে চওড়া হাসি ফুটে ওঠে। বিনয়ে গলে যেতে যেতে হাতজোড় করে বলেন, 'আসুন দিদি, আসুন। বসুন—' সঞ্চারী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মালবিকার পাশে বসার পর তিনিও ধীরে ধীরে বসে পড়েন। জিগ্যেস করেন, 'ভালো আছেন?'

বুকের ভেতর একনাগাড়ে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছিল সঞ্চারীর। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ। কোনও রকমে বলল, 'হ্যাঁ।'

মহেশ্বর বলেন, 'আপনাদের অর্গানাইজেশনের কাজ ঠিকঠাক চলছে তো?'

যেন 'আশ্বাস'-এর কাজকর্ম নিয়ে লোকটার ঘুম হচ্ছে না। তারই খোঁজখবর নেবার জন্য সে ছুটে এসেছে। সঞ্চারী বুঝতে পারছে লোকটা এই সব ভ্যাজর ভ্যাজর দিয়ে শুরু করে জমি তৈরি করছে। তারপর আসল প্রসঙ্গে চলে আসবে। নিরুৎসুক সুরে সঞ্চারী বলে, 'হ্যাঁ, যেমন চলে—'

'এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে প্রচুর টাকা পয়সা দরকার। আমার জানাশোনা অনেক বিজনেসম্যান আছে। যদি বলেন তাদের কাছ থেকে ডোনেশনের ব্যবস্থা করতে পারি।'

লোকটা নাকের ডগায় টাকার টোপ ঝুলিয়ে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। না, ওর পাতা ফাঁদে গলা বাড়িয়ে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। সতর্কভাবে সঞ্চারী বলে, 'দেশের অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস আর বিদেশের নানা ওয়েলফেয়ার ফান্ড আমাদের গ্রান্ট, ডোনেশন রেগুলারলি দিয়ে থাকে। তাতেই আমাদের চলে যায়।'

বড়শিটা ঠিকমতো সঞ্চারীদের নাকে গাঁথা গেল না। একটু হয়তো হতাশ হলেন মহেশ্বর, তবে তাঁর উদ্যম পুরোপুরি নষ্ট হল না। বললেন, 'যদি কখনও দরকার হয়, আমাকে জানাবেন।'

'জানাব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মহেশ্বর এভাবে শুরু করলেন, 'দিদি, সেদিন বলে গিয়েছিলাম, তিন উইক বাদে আসব। কিন্তু একটা জরুরি কাজে আমাকে ক'দিনের জন্যে নর্থ বেঙ্গলে যেতে হয়েছিল, তাই যোগাযোগ করতে পারি নি। ফোন না করে সোজা চলেই এলাম। আমি যে মাস-ম্যারেজের প্রোপোজালটা দিয়ে গিয়েছিলাম, আশা করি, এর ভেতর তা নিয়ে আপনারা ভাবনাচিন্তা করেছেন। 'আশ্বাস'-এর মেয়েদের জন্যে আমি সত্যিকারের সৎপাত্র জোগাড় করেছি। জোর দিয়ে বলতে পারি, এই বিয়েগুলো হলে ওরা সুখে থাকবে। সামাজিক প্রেস্টিজ পাবে।'

ঝুলি থেকে ধূর্ত শিকারি চিতাটা বেরিয়ে পড়েছে। সঞ্চারী উত্তর দেয় না। পলকহীন মহেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই সঙ্গে নিজের মধ্যে তীব্র এক আলোড়ন যেন টের পায়। কেননা চকিতে তার চোখের সামনে কোনও অদৃশ্য

টিভি স্ক্রিনে একজন প্রচণ্ড তেজী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বৃদ্ধের মুখ ফুটে ওঠে—জিতেন্দ্রনাথ। এই মানুষটি তার ভেতর অফুরান সাহস যেন চারিয়ে দিতে থাকেন। সঞ্চারী অনুভব করে হৃৎপিণ্ডে সেই হাতুড়ির ঘা-গুলো আর পড়ছে না। যাবতীয় ত্রাস উধাও হয়ে গেছে।

মহেশ্বর বলেই যাচ্ছিলেন, 'বড়দিদির সঙ্গে বিয়ের বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, যা বলার আপনিই বলবেন।'

সঞ্চারী নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। ভেতর থেকে জিতেন্দ্রনাথ কয়েক লহমায় তাকে অদম্য, জেদী, দুঃসাহসী এক যোদ্ধা করে দিয়েছেন। সে বলে, 'মহেশ্বরবাবু, আমরা নিজেদের মধ্যে আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই, এই বিয়েতে আমাদের মত নেই।'

ঘরের ভেতর আচমকা অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে আসে। একসময় মহেশ্বর জিগ্যেস করেন, 'কারণটা জানতে পারি?'

'না।'

'না মানে?'

সঞ্চারী মহেশ্বরের দিক থেকে চোখ সরায় নি। বলল, 'কেন এই সিদ্ধান্ত তা নিয়ে কারওকে কোনও কৈফিয়ত দিতে আমরা রাজি নই। সেটা সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব ব্যাপার।'

মহেশ্বরের চোখে আগুনের ঝলক দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে যায়। তিনি মাথা গরম করেন না। মেজাজটা নিয়ন্ত্রণে রেখে শান্ত গলায় বলেন, 'ঠিক আছে, কেন আপনারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে ব্যাপারে কিছু জানতে চাইছি না। তবে একটা অনুরোধ আছে—'

'বলুন।'

'আপনারা বরং আরও কিছুদিন সময় নিন। এক মাস, দু'মাস। তার বেশি নয় কিন্তু। তা হলে ভালো ছেলেগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

সঞ্চারী বলল, 'নতুন করে ভাবাভাবির কিছু নেই। আমরা নানা দিক থেকে আপনার প্রোপোজালটা অ্যানালাইজ করে দেখেছি। 'আশ্বাস'-এর মেয়েদের বিয়ে আমরা দেব না। ওরা অনেক কষ্ট পেয়েছে। নতুন করে প্রবলেম তৈরি হোক, তা আমরা চাই না।'

'প্রবলেম হবে, এটা ধরে নিচ্ছেন কেন?'

'প্লিজ, এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করবেন না। আমাদের নিজেদের মতো থাকতে দিন।'

'এটাই আপনাদের শেষ কথা?'

সঞ্চারী জবাব দিল না।

মহেশ্বর শেষ বারের মতো অনুরোধ জানান, 'এত বড় একটা কাজে হাত দিয়েছি, ওটা নষ্ট হতে দেবেন না। প্লিজ আরেক বার বিবেচনা করুন।'

সঞ্চারী এবার বলে, 'আমাদের যা বলার বলে দিয়েছি। এ নিয়ে ডিসিশন চেঞ্জ করার কারণ নেই। দয়া করে আর রিকোয়েস্ট করবেন না।'

ব্যর্থ, হতাশ মহেশ্বর শেষ অব্দি তাঁর দাঁতনখ সুদ্ধ আসল চেহারাটা বার করলেন। করাতের মতো কেটে কেটে বললেন, 'কাজটা কিন্তু ভালো করলেন না সঞ্চারীদিদি। এর ফল আপনাদের ভুগতে হবে।'

মহেশ্বর তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে চলে যাবার পর উদ্বিগ্ন মালবিকা বললেন, 'লোকটা কিরকম শাসানি দিয়ে গেল দেখলে? আমাদের একটা মহাশত্রু তৈরি হল।'

সঞ্চারী ভরসা দেবার সুরে বলল, 'ভাববেন না বড়দি, আমি স্যারকে এক্ষুনি ফোন করে সব জানাচ্ছি।'

জিতেন্দ্রনাথের বাড়িতে ফোন করতে ওধার থেকে অরুণেশের গলা ভেসে এল, 'কে, সঞ্চারীদেবী?'

ও বাড়িতে ফোন করলে জিতেন্দ্রনাথ নিজেই ধরেন। অবশ্য অরুণেশ তাঁর ঘরে সেই সময় থাকলে তিনিও ধরে বাবাকে দেন। ফোনে শুনে শুনে সঞ্চারীর কণ্ঠস্বর চেনা হয়ে গেছে অরুণেশের। সঞ্চারী সাড়া দিলে তিনি বললেন, 'বাবা বাড়ি নেই।'

সঞ্চারী অবাক। অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষটি, যাঁর নড়াচড়ার শক্তি প্রায় নেই বললেই হয়, তাঁর হঠাৎ কী এমন হল যে বাড়ির বাইরে যেতে হয়েছে? সে জিগ্যেস করে, 'তিনি কোথায় গেছেন?'

'আপনি তো ক'দিন ফোন করেন নি, তাই জানেন না। কাল দুপুরে বাবার শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হয়, তাই নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হয়েছে।'

তিন সপ্তাহ পেরুবার পরও যখন মহেশ্বর নস্কর 'আশ্বাস'-এ আসছিলেন না, সঞ্চারীদের উৎকণ্ঠা অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। তাই মাঝখানে ক'দিন আর

ফোন করে জিতেন্দ্রনাথকে বিরক্ত করে নি সে। কিন্তু এই মুহূর্তে অরুণেশের কাছে যে খবরটা পাওয়া গেল তাতে সারা শরীর হিম হয়ে গেছে। মহেশ্বর নস্করের মতো দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য জিতেন্দ্রনাথই হচ্ছেন ওদের সবচেয়ে বড় শক্তি, সবচেয়ে জোরালো অস্ত্র। পরিস্থিতি যা দাঁড়াল তাতে ওই লোকটার কথামতো না চললে সে তাদের ছিঁড়ে ফেলবে।

সঞ্চারী জিগ্যেস করে, 'বাড়িতে তো তিনি মোটামুটি ভালোই ছিলেন। হঠাৎ কী এমন হল, যে নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হয়েছে?'

'যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। তার ওপর স্ট্রোক, বাইপাস সার্জারি—শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। রেজিস্টান্সের ক্ষমতা নেই। হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে।'

'ডাক্তাররা কী বলছেন?'

'অনেক কিছু চেক-আপ করতে হবে। বেশ কিছু দিন অবজারভেসনে রাখা দরকার। বাড়িতে সেসব হওয়া সম্ভব নয়।'

'কোন নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন?'

'শ্যামবাজারে 'গুড হেল্‌থ নার্সিং হোম'-এ।'

'আমি আজকালের মধ্যে দেখা করতে যাব।'

'এখন দেখা হবে না। ডাক্তারদের বারণ।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অরুণেশ বললেন, 'আপনাদের হোম নিয়ে কি প্রবলেম দেখা দিয়েছে?'

কুণ্ঠিতভাবে সঞ্চারী বলে, 'হ্যাঁ—'

'বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর ওঁকে বলব। উনি নিশ্চয়ই আপনাদের ফোন করবেন। কিন্তু তার আগে কিছুই জানানো ঠিক হবে না।'

প্রথম যেদিন সঞ্চারী জিতেন্দ্রনাথদের বাড়ি যায়, অরুণেশকে রীতিমতো কঠোর মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁর কণ্ঠস্বর অনেক নরম। তাঁকে একেবারে অন্যরকম লাগছে।

অরুণেশ ফের বললেন, 'বাবা যে এত অসুস্থ, তবু বলেছেন, 'আশ্বাস'-এ মহেশ্বর নস্কর যদি কোনওরকম ঝামেলা করতে আসে, তাঁকে যেন তক্ষুনি বলা হয়। বুঝতেই পারছেন. এই অবস্থায়—'

অরুণেশের দুর্ভাবনার কারণটা বুঝতে পারছিল সঞ্চারী। মহেশ্বরের ব্যাপারে

জিতেন্দ্রনাথই তাদের শেষ অবলম্বন। মহেশ্বর যদি সত্যিই সংকটের সৃষ্টি করেন, নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়া একজন মানুষকে তা নিয়ে উদ্‌ব্যস্ত করে তোলা ঠিক নয়। সে টের পায় তার উৎকণ্ঠা শতগুণ বেড়ে গেছে। জিতেন্দ্রনাথের জন্য তো বটেই, তার চেয়ে অনেক বেশি 'আশ্বাস'-এর জন্য। কী উত্তর দেবে, সে ভেবে পেল না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সঞ্চারী বলল, 'স্যারকে কি একবার নার্সিং হোমে দেখতে যেতে পারি? কোনও কথা বলব না। দূর থেকে দেখে আসব।'

অরুণেশ বললেন, 'এখন থাক। বাবা একটু সামলে উঠুন। তারপর আমিই আপনাকে খবর দেব। তখন যাবেন।'

'আচ্ছা—'

অপার নৈরাশ্য নিয়ে ধীরে ধীরে ফোন নামিয়ে রাখে সঞ্চারী।

মালবিকা অরুণেশের কথা শুনতে পাননি। তবে সঞ্চারীর প্রশ্ন এবং উত্তর থেকে মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছেন। তবু জিগ্যেস করলেন, 'কী বললেন অরুণেশবাবু?'

সঞ্চারী ধীরে ধীরে সবিস্তার সবটাই বলে গেল।

মালবিকা হতবুদ্ধির মতো বললেন, 'তা হলে উপায়?'

'জানি না কী হবে।'

রাত্রিবেলা টালিগঞ্জের আবাসনে ফিরে খাওয়া দাওযার পর সঞ্চারী দীপককে ফোন করল। জিতেন্দ্রনাথের সাহায্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই সময় দীপক যদি কলকাতায় থাকত, সে অনেকখানি ভরসা পেত।

সমস্ত শোনার পর দীপক বলল, 'কলকাতায় ফেরার কোনও পসিবিলিটিই দেখছি না। কবে যে আমাকে ট্রান্সফার করবে, বুঝতে পারছি না। মহেশ্বর নস্করের মতো লোকেরা মারাত্মক। মাথা ঠাণ্ডা রেখে খুব ট্যাক্টফুলি ওদের ফেস কোরো। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে ভীষণ বিপদ পড়ে যাবে।'

হাজার মাইল দূর থেকে এর বেশি পরামর্শ দীপক কী আর দিতে পারে? সঞ্চারীর নৈরাশ্য এবং দুশ্চিন্তাটা আরও একটু তীব্র হয়।

॥ তেরো ॥

মহেশ্বরের কথায় রাজি না হওয়ার ফল যে এমন ভয়াবহ হবে, কে জানত! দিনকয়েক পর দেখা গেল, 'আশ্বাস'-কে ঘিরে এক কিলোমিটারের মতো পুরো এলাকা পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। সেগুলোতে বড় বড় হরফে লেখা : মেয়েদের নিয়ে 'আশ্বাস'-এ পতিতাবৃত্তি চালানো হচ্ছে। সবাই প্রতিবাদ করুন।

দু'-চারটে মিটিংও করা হল। একদিন স্লোগান দিতে দিতে একটা লম্বা মিছিল 'আশ্বাস'-এর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এসব কার কাজ বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। অমরনাথদের তিরিশ লাখ টাকার মামলা, সেই ব্যাপারে রোজ ডাকে-আসা গণ্ডা গণ্ডা চিঠি, তার ওপর মহেশ্বরদের এই কুৎসিত আক্রমণ, সব যেন বেড়াজালের মতো সঞ্চারীকে ঘিরে ধরেছে। মানুষ যে কত নোংরা হতে পারে, হিংস্র জন্তুর চেয়েও কত মারাত্মক, ক্রমশ টের পাচ্ছিল সে। নানা দিক থেকে সংকট তাড়া করতে করতে আলোবাতাসহীন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর তাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। শ্বাস আটকে আসছে তার।

এতগুলো সমস্যা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসবে, উদ্‌ভ্রান্ত সঞ্চারী যখন তলকূল খুঁজে পাচ্ছিল না, সেই সময় হঠাৎ একদিন অরুণেশের ফোন এল।— 'বাবা এখন অনেকটা ভালো আছেন। মহেশ্বর নস্করদের বজ্জাতির খবরটা পেয়েছেন। আপনাকে আর মালবিকাদিকে মহেশ্বরের ফোন নাম্বারটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা করতে বলেছেন।'

ফোনটা পাওয়ার পর সঞ্চারীর স্নায়ুমণ্ডলীতে যেন তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায়। সেদিন তারা নার্সিং হোমে গিয়ে জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কেবিনে গিয়ে দেখা করল।

জিতেন্দ্রনাথ তাঁর বেডে শুয়ে ছিলেন। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বললেন, 'মহেশ্বর নস্কর যে শয়তানি করবে সেটা আমি জানতাম। তাই অরুণের কাছ থেকে রেগুলার খবর নিচ্ছিলাম। অরুণ প্রথমটা আমার শরীরের কথা ভেবে টালবাহানা করছিল। পরে ধমক খেয়ে সব জানায়। তোমরা ওর মোবাইল ফোনের নাম্বারটা এনেছ তো?'

সঞ্চারী একটুকরো কাগজ তার ব্যাগ থেকে বার করে জিতেন্দ্রনাথকে দিল। ওটায় মহেশ্বরের নাম্বারটা লেখা আছে। সেই সঙ্গে নিজের সেল ফোনটাও দিল। একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'স্যার, রাগারাগি করবেন না। আপনার শরীরের পক্ষে উত্তেজনা ভালো নয়।'

উত্তর দিলেন না জিতেন্দ্রনাথ। শান্ত দৃষ্টিতে একবার সঞ্চারীকে দেখে সামান্য হেসে ফোনে মহেশ্বর নস্করকে ধরে ফেললেন। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। নিজের নাম জানিয়ে বললেন, 'মহেশ্বর, আমি এখনও মরে যাই নি। 'আশ্বাস'-এর মেয়েদের নিয়ে তুমি কী করতে চাও, সব বুঝতে পারছি। আমি আপাতত নার্সিং হোমে আছি। পরশু আমাকে রিলিজ করবে। প্রথমে রথতলা এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে তোমার কীর্তি কাহিনি জানিয়ে দেব। তারপর হাজার হাজার মানুষ নিয়ে মঞ্চ তৈরি করে 'আশ্বাস'-এর সামনে বসব। তোমার দুষ্কর্মের লিস্ট আমার কাছে আছে। সাধারণ মানুষ তা জেনে যাবে। তুমি হয়তো বন্দুকবাজ পাঠিয়ে দেবে। তাতে লাভ হবে না। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। যদি নিজের ভালো চাও, 'আশ্বাস'-এর দিকে হাত বাড়াবে না। দু'দিন তোমাকে সময় দিলাম। এর মধ্যে চারদিকে যেসব পোস্টার লাগিয়েছ, লোক দিয়ে সমস্ত তুলে ফেলবে। আশা করি, আমার কথাগুলো তোমার মর্মে প্রবেশ করেছে।'

দু'দিন পর দেখা গেল, যে কুৎসিত পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছিল, সব ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। সঞ্চারীদের বিরুদ্ধে স্লোগান আর শোনা যাচ্ছে না, মিছিলও চোখে পড়ছে না। আরও তিনদিন বাদে সকালে অফিসে যাবার জন্য রাস্তায় অটোর আশায় সঞ্চারী দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ একটা মারুতি-ওমনি তার পাশে এসে থামে। অতি পরিচিত একটি মুখ জানালার বাইরে ঝুঁকে বলে, 'উঠে এস—' বলেই দরজা খুলে দেয়।

দীপক। নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। হতবাক তাকিয়েই থাকে সঞ্চারী।

দীপক তাড়া লাগায়, 'কী হল, ওঠ। পেছনে গাড়ির লাইন লেগে গেছে। হর্ন দিয়ে দিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিচ্ছে—'

ঘোরের মধ্যেই ভেতরে ঢুকে পড়ে সঞ্চারী। ফ্রন্ট সিটে দীপকের পাশে বসতে বসতে জিগ্যেস করে, 'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি—'

ড্রাইভ করতে করতে দীপক বলে, 'পরশু কলকাতায় আমার ট্রান্সফারের অর্ডার বেরিয়েছে। কাল সন্ধের ফ্লাইটে চলে এসেছি। আজ সকালে উঠেই ছুটে এলাম। ভাবলাম, তুমি বেরুবার আগেই তোমাদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে যাব। দেখি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছ।'

সঞ্চারী বলে, 'তুমি যে ট্রান্সফার হয়ে আসছ, আগে জানাওনি তো?'

'আচমকা দেখা করে সারপ্রাইজ দেব বলে। তা কোথায় যাচ্ছিলে? অফিসে?'

'হ্যাঁ। অটোয় টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে পাতাল রেলে—'

সঞ্চারীকে থামিয়ে দিয়ে দীপক বলে, 'জানি, জানি। অটো, তারপর টিউব ট্রেন, তারপর মিনি। কলকাতার প্রায় সব রকম ট্রান্সপোর্ট লাগে তোমার অফিসে পৌঁছতে। সে যাই হোক, আজ তুমি অফিস যাচ্ছ না।'

'কী বলছ!'

'আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। আর তুমি অফিসে যাবে!' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় দীপকের।—'ও হ্যাঁ, মহেশ্বর নস্করের ঝামেলাটা অবশ্য আছে। তা হলে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে সঞ্চারী বলে, 'ওই প্রবলেমটা আর নেই। স্কাউন্ড্রেলটার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি।'

'মিরাকলটা ঘটল কী করে?'

বিশদভাবে জিতেন্দ্রনাথের কথা জানিয়ে দিল সঞ্চারী।

'গ্রেট অ্যান্ড ব্রেভ সোল। একদিন গিয়ে ওঁকে প্রণাম করে আসব। নিয়ে যেও কিন্তু—'

'নিশ্চয়ই।'

'যাক, একটা বড় সমস্যা কেটেছে। এখন তো ফ্রি?'

'ফ্রি আর কোথায়? সেই তিরিশ লাখ টাকার মামলাটা মাথার ওপর ঝুলছে না?'

'আমি তো এসে গেছি। তোমার ল'ইয়ার আছেন। ওদিকটা আমি সামলাব। ডোন্ট ওয়ারি।' বলতে বলতে গলার স্বরটা তরল হয়ে যায় দীপকের।—'আজ অফিসে যাচ্ছ না, মোবাইলে তোমার মালবিকাদিকে সেটা জানিয়ে দাও।'

'তুমি একটি আস্ত শয়তান।'

একসময় নানা রাস্তা পেরিয়ে ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে ময়দানে চলে আসে সঞ্চারীরা। রেসকোর্সের কাছাকাছি গাড়ি পার্ক করে দীপক বলে, 'ড্রাইভ করতে করতে কথা বলতে অসুবিধে হয়। চল ওখানে গিয়ে বসি—'

দু'জনে সবুজ ঘাসের কার্পেটে পাশাপাশি বসে। এটা-সেটা হাজারটা কথার

পর সঞ্চারী বলে, 'আমাকে কত সমস্যা যে ঘিরে ধরেছিল! একেক সময় মনে হত আত্মহত্যা করি।'

'মাই গড! তুমি আত্মহত্যা করলে আমার কী হত?' চোখ বড় বড় করে মজাদার একটা ভঙ্গি করে দীপক। তাবপব ধীরে ধীরে তার মুখচোখ বদলে যেতে থাকে, একটা হাত সঞ্চারীর কাঁধের ওপর রেখে নিজের দিকে তাকে একটু টেনে নেয়। গাঢ় আবেগের সুরে বলে, 'ট্রান্সফারটা পেতে অনেক দেরি হত। শেষ পর্যন্ত আমার সেই আত্মীয়টির হাতে-পায়ে ধরে তাড়াতাড়ি ওটার ব্যবস্থা করে নিলাম। কেন জানো?'

'কেন?'

'শুধু তোমার জন্যে। তোমাকে এখানে রেখে দিল্লিতে থাকতে কী কষ্ট যে হচ্ছিল!'

গভীর চোখে দীপকের দিকে তাকায় সঞ্চারী। তাকিয়েই থাকে।

ভুরু নাচিয়ে সঞ্চারীর ঠোঁটের দিকে চোখ রেখে দীপক বলে, 'খুব ইচ্ছে করছে—'

সঞ্চারী আঁতকে ওঠে, 'না না, প্লিজ। চারদিকে কত গাড়ি যাচ্ছে, কত লোকজন!'

মুষড়ে পড়ার ভান করে দীপক, 'থাক তা হলে। পরে কিন্তু একটার জায়গায় পঁচিশটা—'

সঞ্চারী উত্তর দেয় না। বহুকাল পর তার মনে হল, পৃথিবীতে প্রচুর আলো, অজস্র বাতাস। আরামে বুক ভরে শ্বাস টানে সে।